জীবন-তরঙ্গ

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

এ. কে. সরকার অ্যাণ্ড কোং
৬।১ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রকাশক :
শ্রীঅনিলকুমার সরকার
৬।১ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

মূল্য :
দুই টাকা পঞ্চাশ পয়সা

প্রচ্ছদ :
চারু খাঁন

মুদ্রক :
শ্রীধনঞ্জয় রায়
মুদ্রণশ্রী প্রেস
১৫।১ ঈশ্বর মিল লেন
কলিকাতা-৬

ভূমিকা

আজ যে কর্ম করছি তার জন্য বিনম্র শ্রদ্ধা প্রয়োজন সর্বাগ্রে। সেই বিনম্র শ্রদ্ধা নিয়েই কবি সত্যেন্দ্রনাথের অনূদিত উপন্যাসখানির ভূমিকা লিখতে বসেছি। ভূমিকা বলতেও সঙ্কোচ বোধ করছি। কারণ এটি কোনক্রমেই ভূমিকা হতে পারে না। কারণ কবি সত্যেন্দ্রনাথের কোন রচনা অন্য কারও ভূমিকার অপেক্ষা রাখে না। তবু মনে মনে অনুভব করছি আমি আজ যেটুকু লিখতে বসেছি সেটুকু লেখার প্রয়োজন ছিল।

কারণ কবি সত্যেন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যের স্বর্ণ-সিংহাসনে চিরস্থায়ী হয়ে থেকে চিরকাল বাঙালী কাব্য-রসপিপাসুর শ্রদ্ধা ও প্রেম আকর্ষণ করবেন ও করছেন। কিন্তু তাঁর এই গদ্য রচনাটি বিলুপ্ত হতে বসেছিল। এ. কে. সরকার অ্যাণ্ড কোং সেই লুপ্তিপথযাত্রী রচনাটিকে আবার পুনরুদ্ধার করে বাঙালী পাঠকের কৃতজ্ঞতাভাজন হলেন।

সত্যেন্দ্রনাথের জীবিতকালে সব রকমের রচনা মিলিয়ে সব সমেত পনর খানি বই প্রকাশিত হয়েছিল। এই বইগুলির প্রকাশ কাল ১৯০ থেকে ১৯২১ সালের মধ্যে। স্বাভাবিক ভাবেই এগুলির মধ্যে অধিকাংশই কাব্য গ্রন্থ। এর মধ্যে কেবল দুটি গদ্য রচনা। তার মধ্যে একটি বারোয়ারি উপন্যাসের বহু পরিচ্ছেদের মধ্যে তিনটি পরিচ্ছেদ কবির রচনা। তার পৃষ্ঠা সংখ্যা পঁয়ত্রিশ। অপর রচনাটি সম্পূর্ণ তাঁর রচনা। এবং সে হিসাবে এইটিই তাঁর একমাত্র একক গদ্য রচনা।

রচনাটি আলোচ্য গ্রন্থখানি। যা আজ ভিন্ন নামে 'জীবন-তরঙ্গ' বলে চিহ্নিত হয়ে পুনরায় প্রকাশিত হচ্ছে। লোক-পরম্পরায় শুনেছি এই গ্রন্থখানি সত্যেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের নির্দেশক্রমে অনুবাদ করেছিলেন। নরওয়ের সুবিখ্যাত ঔপন্যাসিক Jonas Lie রচিত Livsslaven নামে উপন্যাসের অনুবাদ এখানি। গ্রন্থখানি অনূদিত হয়ে ১৩১৮ সালের জ্যৈষ্ঠ থেকে চৈত্র পর্যন্ত প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়। এবং তারপর সামান্য 'একটু-আধটু' পরিবর্তন করে বাংলা ১৩১৯ সালের দক্ষিণায়ন-সংক্রান্তিতে, ইংরাজী ১৯১২ সালের ২০শে জুলাই তারিখে 'জন্মদুঃখী' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

সেদিনের প্রকাশ কাল থেকে পঞ্চাশ বছর, যাকে আমরা বলি অর্ধ শতাব্দী, পার হয়ে গেল। রচনাটি কবির কবিখ্যাতির আড়ালে হারিয়ে গিয়ে বিলুপ্ত হতে বসেছিল। বর্তমান প্রকাশক কবির সহধর্মিণীর অনুমতি নিয়ে গ্রন্থখানি পুনরায় প্রকাশ করলেন।

রচনাটির ভাষা আজকের ব্যবহৃত ভাষা থেকে ভিন্ন, গ্রন্থখানি তখনকার কালের রেওয়াজে সাধু ভাষায় রচিত। তাই আজকের চলিত ভাষায় অভ্যস্ত পাঠক-পাঠিকার কাছে এর স্বাদ স্বভাবতই একটু পৃথক ধরণের হবে। তবু পাঠককে সম্পূর্ণ আশ্বস্ত করার জন্য বলতে পারি ভাষার সহজ ভঙ্গি ও ভাব-প্রকাশের পরিণত শক্তির ফলে পাঠক অত্যন্ত সহজে এ ভাষা ও এ ভাষার আড়ালের ভাবকে আপনার করে গ্রহণ করতে পারবেন।

মূল গ্রন্থখানির কাহিনী ও চরিত্র দূর উত্তর ইউরোপের, এবং এ কাহিনীর কালও স্বাভাবিকভাবে ষাট বছর আগের। যখন পৃথিবী অনেক নির্জন ছিল, শিল্প-সভ্যতা যখন আজকের মত পরিব্যাপ্ত হয়নি, তখন মানুষের দুঃখ ও সুখ যেন অনেক স্পষ্ট ছিল, মানবিক বেদনার যেন আরও মূল্য ছিল। এ কাহিনী সামান্য মানুষের সামান্য ও সাধারণ দুঃখ-বেদনার কাহিনী। কিন্তু সামান্যের দুঃখ-বেদনার তখন অসামান্য মূল্য ছিল বলেই সামান্যের দুঃখ-বেদনা এখানে অসামান্য হয়ে উঠেছে। এবং অপরূপ রসমূর্তি গ্রহণ করে পাঠককে আনন্দ দেবার জন্যে আজও তার অম্লান রসোজ্জ্বল মূর্তি ধারণ করে পাঠকের জন্য অপেক্ষা করছে।

সেই রসবস্তুকেই আজ অর্ধ শতাব্দী পরে আবার বাঙালী পাঠকের হাতের দিকে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে অগ্রসর করে দিলাম।

টালা পার্ক, কলিকাতা-২ **তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়**

১৩৫৩ সাল

জীবন-তরঙ্গ

এক

লোকে কথায় বলে, "শৈশবে রাজার ছেলে এবং গরীবের ছেলেতে কোনো তফাৎ নাই; স্বয়ং দেবতারা শিশুদের রক্ষক।" কিন্তু বার্বারার ছেলে নিকোলার উপর যে কোন দেবতার প্রসন্ন দৃষ্টি ছিল তাহা বুঝিয়া উঠা ভারি কঠিন।

শহরের বাহিরে পাকা রাস্তার উপর টিন-মিস্ত্রির দোকানঘর। সেই ঘরখানিতে অনেক রাত্রি পর্যন্ত টিম্ টিম্ করিয়া প্রদীপ জ্বলিত এবং সময়ে সময়ে নগরযাত্রী আগন্তুকের দল অন্যত্র রাত্রিবাসের সুবিধা করিতে না পারিলে উহারই মধ্যে আসিয়া আশ্রয় লইত। কত মাতাল আসিয়া হল্লা করিত, হাঙ্গামা করিত, পরস্পর মারামারি করিতে করিতে শিশু নিকোলার দোলা উল্টাইয়া ফেলিত; কখনো বা নেশার ঝোঁকে তাহার উপরেই আড় হইয়া পড়িত।

নিকোলার মা বার্বারা পল্লীগ্রামের মেয়ে, যেমন গড়ন তেমনি রং, তেমনি স্বাস্থ্য। তাহার মুখ নিটোল, বুক-পিঠ পরিপুষ্ট, দাঁত যেন ঠিক টাট্‌কা দুধের ফেনার মতো। গ্রামের হাটে যাহারা গরু বেচিতে আসিত, তাহাদের মুখে শহরের গল্প শুনিতে শুনিতে শহর দেখিবার জন্য তাহার মন ব্যস্ত হইয়া উঠিল। কিছুদিন পরে সে গতর খাটাইবে বলিয়া শহরে চলিয়া আসিল।

শহরের সঙ্গে কিন্তু সে কিছুতেই খাপ খাইতে পারিল না। বার্বারার পক্ষে নগরে বাস করা গরুর পক্ষে সিঁড়ি ভাঙিয়া ওঠার মতো দুঃসাধ্য বোধ হইতে লাগিল। সে বাজারে বাজারে ঘাস-বিচালির স্তূপ দেখিয়া বেলা কাটাইত এবং শহরের ঘাস যে তাহার দেশের ঘাসের মতো নয়, এ কথা সে পরিচিত অপরিচিত সকলের কাছেই বড় গলা করিয়া বলিতে ছাড়িত না।

কিন্তু সে যে এই রকম করিয়া সমস্ত সকালবেলাটা নষ্ট করিবে তাহার মনিবের ঠিক সে রকম কল্পনা ছিল না। সুতরাং স্বভাবতঃ বদ্‌মেজাজী না হইলেও, বার্বারাকে প্রায়ই মনিব বদলাইতে হইত। বার্বারা চোর নয়, বিশেষ কুচরিত্রা নয়, তাহার প্রধান দোষ সে শহরের লোকের সঙ্গে মানাইয়া

চলিতে পারে না, শহরের চাকরি করিতে হইলে যে সমস্ত গুণ থাকা প্রয়োজন বার্বারার তাহা কিছুই নাই।

কিন্তু সমাজ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবার পাত্র নয়। সে কলে ফেলিয়া অকেজো লোকের প্রকৃতি বদলাইয়া তাহাকে নিজের কাজে খাটাইয়া তবে ছাড়ে। সে বার্বারাকেও ছাড়িল না, পাড়াগেঁয়ে বার্বারাকে সমাজ শহরের কাজে লাগাইল। বার্বারা 'ছেলের-ঝি' হইল।

এই উন্নতির যুগে, নাচ, ভোজ ও হুজুগের হিড়িক্ ক্রমে এতটা বাড়িয়া উঠিয়াছে যে, বড় ঘরের মেয়েদের পক্ষে ছেলের-ঝি ভিন্ন একদণ্ড চলা অসম্ভব।

এখন ডাক্তারেরাও বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন, "ইহাই তো প্রকৃতির নিয়ম—গরুর মতো দুধ যোগাইবে আবার সেই সঙ্গে মানুষের মতো বুদ্ধি খরচ করিয়া কাজ করিবে এমন তো হইতে পারে না। শিশুর স্নায়ু সবল করিতে হইলে যে শ্রেণীর মেয়ের রক্ত ভাল এবং স্বভাবতঃ স্নায়ু সবল তাহাদের স্তন্যের বন্দোবস্ত কৃত্রিম উপায়েও শিশুর মঙ্গলের জন্য করা উচিত।"

সুতরাং কৌসুলী ভীর্গ্যাং সাহেবের সদ্যোজাত যমজদের জন্য একজন অসাধারণ রকমের স্বাস্থ্য-সম্পন্ন ছেলের-ঝির খোঁজ চলিতেছিল।

কৌঁসুলী সাহেবের মাহিনা-করা ডাক্তার, ভীর্গ্যাংগৃহিণীর মন যোগাইবার জন্য, ছেলের-ঝির খোঁজ করিতেছিলেন। একদিন তিনি একগাল হাসিয়া শ্রীমতী ভীর্গ্যাংকে বলিলেন, "পাওয়া গেছে, চমৎকার ছেলের-ঝির সন্ধান পাওয়া গেছে। চমৎকার স্বাস্থ্য। মহম্মদকে পবতে যেতে হল না, পর্বতই মহম্মদের কাছে হাজির। তার গা থেকে গোহালের গন্ধ এখনো সম্পূর্ণ যায়নি। ঐ রকমই তো চাই; বিশেষ যখন গরুর দুধেও ফুকো চলছে, তখন এরকম দুগ্ধভাগ্য তো সৌভাগ্যের কথা। বয়সও অল্প, কুড়ির বেশি নয়।"

বার্বারা যখন রাস্তার কলে জল লইতে কি কাপড় কাচিতে আসিত, তখন সে স্বপ্নেও জানিত না যে সে একজন বড় ডাক্তারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে এবং অল্পদিনের মধ্যেই শহরের মধ্যে একজন বিশিষ্ট লোক হইতে চলিয়াছে।

বড়লোকের ছেলের-ঝি একজন বিশিষ্ট লোক, সে অনেক গরীবের উপর ভক্তির দাবি রাখে। ছেলের-ঝি মনিবের ছেলে মানুষ করিতে গিয়া

একদিকে নিজের ছেলেকে স্তন্যে এবং স্নেহে বঞ্চিত করিতে বাধ্য হয়। অন্যদিকে সে দমের গদিতে শুইতে পায়, ভাল-মন্দ খাইতে পায়, মনিবের কাছে আবদার জানায় এবং দাস-দাসীদের উপর আধিপত্য করে। শেষে যখন দুধ ছাড়িয়া যায় এবং মনিবের গৃহে নূতন শিশু জন্মগ্রহণ করে, তখন নূতন ছেলের-ঝি আসিয়া তাহাকে স্থানচ্যুত করে এবং অন্নে মারে।

কিন্তু গরীবের মেয়ে যদি তাহার একমাত্র নিজস্ব সম্পত্তি—তাহার বুকের রক্ত—স্তনের দুধ তাহার নিজের ছেলেকে দেওয়াই ভাল মনে করে, সে স্বতন্ত্র কথা। সে যদি নিজের ভাল-মন্দ না বোঝে, সমাজের ভদ্রলোকদের কাজে না লাগে, তবে পরিণামে তাহারই অদৃষ্টে দুঃখ আছে, ইহা আমাদের সমাজতত্ত্বজ্ঞ ডাক্তার সাহেবের মত।

বার্বারা এমনি বোকা যে, প্রথম প্রথম সে সমাজতত্ত্বের এই গোড়ার কথাটা মোটেই কানে তুলিত না,—এমনি একগুঁয়ে।

রাস্তার মোড়ে গাড়ী রাখিয়া ডাক্তার সাহেব ইহারই মধ্যে তিন-চার দিন টিন-মিস্ত্রির দোকানে আসিয়া বার্বারার সঙ্গে দেখা করিয়া গিয়াছেন। প্রতিবারেই মাহিনা বাড়াইয়া বলিয়াছেন, কত বুঝাইয়াছেন, বার্বারা বাগ মানে নাই। বর্তমানে বার্বারার যে সামান্য রোজগার তাহাতে ছেলে মানুষ করা যায় না, ডাক্তার সাহেব তাহাও বলিয়াছেন। কৌসুলী সাহেবের বাড়ীতে চাকরি লইলে যে মোটা টাকা মাহিনা পাইবে তাহার অতি সামান্য অংশ টিন-মিস্ত্রির হাতে মাসে মাসে দিলেই, সে নিজের ছেলের মতো করিয়া বার্বারার ছেলেটির তত্ত্বাবধান করিবে। ইহা ছাড়া সে ছেলেকে একেবারে ছাড়িয়া যদি না-ই থাকিতে পারে, মাঝে মাঝে তাহাকে দেখিতে ইচ্ছা হয়, তবে মাঝে মাঝে—চাই কি প্রতি মাসেই সেজন্য একবার করিয়া ছুটিও পাইতে পারে। ডাক্তার সাহেব সে বন্দোবস্তেরও ভার লইতে প্রস্তুত আছেন।

ডাক্তার সাহেব মিষ্ট কথা জোরের সঙ্গে বলিতে জানিতেন। তাঁহাকে দেখিলে বার্বারার নিজের বাপের কথা মনে পড়িত। ক্রমশঃ তাঁহার গাড়ী আসিতে দেখিলেই বার্বারার মনে আতঙ্ক উপস্থিত হইত। সাপ দেখিলে পাখী যেমন করিয়া নিজের অসহায় শাবকগুলি পক্ষপুটে ঢাকিয়া উৎকণ্ঠিত ভাবে তাহার গতি নিরীক্ষণ করে বার্বারাও তেম্‌নি ডাক্তারের গাড়ী দেখিলে তাড়াতাড়ি ছেলের দোলা আগলাইতে যাইত।

ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া ওঠা ছাড়া ডাক্তারের প্রশ্নের সে অন্য জবাব জানিত না। কথাবার্তা যাহা বলিবার তাহা টিন-মিস্ত্রির গৃহিণী বলিত। যতক্ষণ তাহাদের কথা চলিত, বার্বারা কেবল ছেলেকে বুকের ভিতর লুকাইয়া শহর ছাড়িয়া পলাইবার ভাবনাই ভাবিত।

শেষে কিন্তু ডাক্তার সাহেব এত বেশি টাকা কবুল করিলেন এবং এম্‌নি আপনার জনের মতো ব্যবহার করিলেন যে বার্বারা প্রায় তাঁহার কথায় স্বীকারই হইয়া পড়িল। ডাক্তার সাহেব তাহার ছেলেটিকে নিজে কোলে করিয়া আদর করিতে করিতে যখন বলিলেন, "এমন সুন্দর ছেলেকে উপায় থাকতে কষ্টের মধ্যে ফেলে রাখতে পারে এমন নিষ্ঠুর কেউ নেই। পয়সার অভাবে এই কচি ছেলে শীতে খিদেয় কষ্ট পাবে, এ একেবারে অসহ্য।" তখন বার্বারা একেবারে গলিয়া গেল।

খানিক পরে একজন প্রতিবেশী আসিয়া ঠিক ঐ কথাই বলিল। পয়সার অভাবে, ঔষধ-পথ্যের অভাবে এই গরীবের বস্তিতে গত দুই বৎসরের মধ্যে কত শিশুই যে অকালে মারা গিয়াছে, তাহারই বর্ণনা করিতে বসিল। টিন-মিস্ত্রির গৃহিণীর মুখেও ঐ একই কথা।

বার্বারা ছেলের কাছটিতে নীরবে বসিয়া সমস্তই শুনিল। মাঝে মাঝে মনে হইতেছিল, দম বুঝি বা বন্ধ হইয়া যাইবে। এক একবার ভাবিতেছিল দেশে ফিরিয়া যাইবে, কিন্তু সেখানে এই অনাথার ভার কে লইবে?

সে আত্মসংবরণ করিল।

সেই রাত্রে তাহার কান্নার বেগ এতই বাড়িয়া উঠিল যে, বাড়ীওয়ালা বিরক্ত হইবে ভাবিয়া, সে আস্তে আস্তে রাস্তায় বাহির হইয়া অন্ধকারে বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়াইয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। প্রাণ ভরিয়া কাঁদিতে পাইয়া সে কতকটা যেন ঠাণ্ডা হইল।

পরদিন সকালে বার্বারা এবং একজন পাড়ার মেয়ে রাস্তার কলের কাছে দাঁড়াইয়া একখানা প্রকাণ্ড সদ্যোধৌত চাদরের দুই মুড়া দুইজন ধরিয়া নিংড়াইতেছে এমন সময়ে টিন মিস্ত্রির দোকান-ঘরের সম্মুখে একখানা গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল এবং জরির পোশাক পরা কোচম্যান গাড়ী হইতে নামিয়া ভিতরে ঢুকিল। সঙ্গে সঙ্গে বার্বারার সঙ্গিনী বলিয়া উঠিল, "এই তোমার শেষ কাপড় কাচা দিদি, এখানকার বরাত তোমার উঠল; ঐ দেখ কৌম্বুলী সাহেবের গাড়ী।"

বার্বারা এমনি জোরে মোচড় দিল যে চাদরে এক বিন্দুও জল রহিল না। আর ভাবিবার সময় নাই। যাহা হইবার তাহা হইয়াছে।

বার্বারা ঘরে গিয়া ছেলেটিকে জামা পরাইল, তাহার মুখ মুছাইল। অথচ সে যে কি করিতেছে সে বিষয়ে তাহার হুঁশ ছিল না।

এদিকে কোচম্যানটা টিন-মিস্ত্রির হাতে কয়েকটা যে টাকা গুঁজিয়া দিয়াছিল, তাহা তাহার দৃষ্টি এড়ায় নাই। লোকটা সেই লজ্জাহীন দরিদ্রের ঘরে নাক যেন সর্বদাই উঁচু করিয়াই আছে। অথচ বার্বারা তাহার দিকে তাকাইলেই—"তাড়াতাড়ি নেই" বলিয়া আশ্বস্ত করিতে ত্রুটি করে না। "কৌঁস্থলী সাহেবের বাড়ী আটটার আগে কেউ বিছানা ছাড়ে না, যথেষ্ট সময় আছে।" এই বলিয়া সে পকেট হইতে ঘড়ি বাহির করিয়া দেখিল। যখনি সে ঘড়ির দিকে তাকায়, বার্বারা তখনি ছেলেটির দিকে চায়। হুকুম আসিয়াছে, তলব পড়িয়াছে, কোলের ছেলে ফেলিয়া যাইবার সময়টুকু পর্যন্ত মাপা হইয়া গিয়াছে।

শিশু ঘুমাইয়া পড়িল। যদি জাগিয়া ওঠে—ভারি মুশকিল হইবে, তখন হয়তো বাবারা তাহাকে কোলছাড়া করিয়া চলিয়া যাইতে পারিবে না।

"তাড়াতাড়ি নেই"--কোচম্যান আবার তাহার রূপার ঘড়িটা বাহির করিয়া বলিল, "তাডাতাডি নেই।"

কোচম্যানের তাড়াতাডি না থাকিলেও বার্বারার বিশেষ রকম তাড়াতাড়ি ছিল। সে আবিষ্টের মতো কাহারো দিকে না চাহিয়া যন্ত্রের মতো গাড়ীর ভিতরে গিয়া বসিল। গাড়ী চলিতে আরম্ভ হইলে তাহার যেন চমক ভাঙিল।

গ্রীষ্মের সময়ে কৌঁসুলী সাহেবের পরিবারের সঙ্গে ছেলের-ঝি বার্বারাও হাওয়া খাইতে গেল। ঠেলা গাড়ীতে শিশু দুটিকে লইয়া সে রাস্তার বাহির হইলেই লোকে বলাবলি করিত, "একেই তো বলি ছেলের-ঝি! কী স্বাস্থ্য! বার্বারার এই সুখ্যাতিতে কৌঁসুলী-গৃহিণীও মনে মনে বেশ একটু গর্ব অনুভব করিতেন।

কিন্তু এই নূতন ঝিটিকে লইয়া মাঝে মাঝে ইঁহাদের ভারি মুশকিলে পড়িতে হইত। মাঝে মাঝে সে কেমন বিমর্ষ হইয়া থাকিত, অন্নজল ছুঁইত না, মনিবের ছেলে দুটিকে কাছে লইয়া তাহার স্তন্য-বঞ্চিত মাতৃক্রোড়-চ্যুত নিজের ছেলেটির কথা মনে করিয়া কাঁদিয়া কাটিয়া অনর্থ করিত।

ভারি মুশকিল! ছেলের-ঝির মন ভাল না থাকা ভারি মুশকিলের কথা। মন ভাল না থাকিলে শরীরও ভাল থাকে না, সঙ্গে সঙ্গে স্তন্যও বিষ হইয়া ওঠে, শিশুদেরও শরীর খারাপ করে।

ভীর্গ্যাং গৃহিণী উহার মন খুশী রাখিবার জন্য নূতন নূতন চাট্নী আচার খাওয়াইতে লাগিলেন, রকম রকম কাপড় জামা বকশিস করিলেন এবং প্রত্যহ উহার ছেলের খোঁজখবর করিবার জন্য চাকরবাকরদের উপর কড়া হুকুম জারি করিয়া দিলেন।

বার্বারা অল্পদিনেই বুঝিতে পারিল যে, তাহাকে অত্যন্ত বাড়াইয়া তোলা হইতেছে। সে-ই যেন বাড়ীর কর্ত্রী। ভাল খাইতে পায়, ভাল পরিতে পায়, অথচ কাজকর্ম কিছুই করিতে হয় না। সে দেখিল, তাহার কাজ-করা কড়া হাত ক্রমশঃ ভদ্রলোকের মতো নরম হইয়া উঠিতেছে। সে আরও বুঝিতে পারিল যে, দিনরাত্রি কাছে কাছে থাকিয়া, হাতে করিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া, মনিবের এই যমজ দুটির উপর তাহার কেমন যেন মায়া বসিয়া যাইতেছে।

কৌম্‌লী পরিবার হাওয়া খাইয়া শহরে ফিরিবার কয়েকদিন পরে, বার্বারা একদিন ছেলেকে দেখিতে যাইবার ছুটি পাইল। তাহার সেই পরিচিত পথটি এখন অত্যন্ত অপরিষ্কার বলিয়া মনে হইতেছিল। মনিব-বাড়ী ফিরিয়া প্রথমেই যে তাহাকে জুতার কাদা সাফ করিয়া লইতে হইবে এই কথাই সে ভাবিতেছিল। আবার অল্পক্ষণের মধ্যেই সে ছেলেকে দেখিতে পাইবে ভাবিয়া তাহার শরীর রোমাঞ্চিতও হইতেছিল। মাঝে মাঝে কান্নাও পাইতেছিল। কিন্তু, উপায় কি? যাহা হইয়াছে ভালই হইয়াছে, এখন ছেলের দুধের জন্য তাহাকে ভাবিতে হয় না, সে এখন দুধের দাম দিতে পারে।

বেড়ার পাশ দিয়া ঘুরিবার সময় দোকান-ঘরখানি চোখে পড়িতেই তাহার গতি মন্থর হইয়া আসিল। হঠাৎ তাহার বুক কেমন কাঁপিয়া উঠিল।

এমন সময়ে তাহার জল আনিবার, কাপড় কাচিবার সঙ্গিনীটির সঙ্গে হঠাৎ দেখা হইয়া গেল। সে বার্বারাকে এক নিশ্বাসে পাড়ার ছোট বড় সকল খবর দমকলের মতো অনর্গল বলিয়া যাইতে লাগিল। টিন-মিস্ত্রির দোকানে সম্প্রতি ভারি হাঙ্গামা গিয়াছে। বার্বারাকে সে সকল কথা খুলিয়াই বলিবে। হাজার হউক সে হইল সই, তাহার ভাল তাহাকে তো দেখিতে হয়। টিন-মিস্ত্রিরা মনে করে লোকের চক্ষু নাই, কেউ কিছু বুঝিতে পারে না। এদিকে

কিন্তু উহাদের সর্বস্ব বন্ধক পড়িয়াছে, বৃষ্টি আট্‌কাইতে ভাঙা জানালায় দিবার মতো একখানা টিন পর্যন্ত ঘরে নাই! কেমন করিয়া যে সংসার চলে তাহা ভগবান জানেন। লোকে বলে, বার্বারা তাহার ছেলের জন্য যে টাকা পাঠায়, তাহার জোরেই নবাবী। ছেলেটাকে তো ফেন খাওয়াইয়া রাখিয়াছে, কাঁদিলে নাকি একটু একটু মদ গেলাইয়া অজ্ঞান করিয়া রাখে। হাঙ্গামার পর হইতে পুলিস বসিয়াছে বলিয়া কেহ তো আর ওখানে মাথা গলায় না।

"আমার পরামর্শ যদি নাও, সই, তবে ছেলেটাকে হল্‌ম্যান্ ছুতারের কাছে রেখে যাও,—ঐ যে যার জেটির ধারে ঘর। ভারি খাঁটি লোক। আমার মুখে ছেলেটার কষ্টের কাহিনী শুনে বেচারা সেদিন ভারি দুঃখ কচ্ছিল।"

হল্‌ম্যান্ ছুতার! হল্‌ম্যান্ ছুতার! বিমর্ষভাবে দোকান ঘরের দিকে যাইতে যাইতে বার্বারার কানে ঐ নামটাই বারবার বাজিতেছিল।

ঘরে ঢুকিয়া বার্বারা দেখিল, তাহার আদরের নিকোলা কতকগুলা ময়লা কাঁথার মধ্যে শুইয়া আছে। অযত্নে তাহার শরীর শীর্ণ, বর্ণ ফ্যাকাশে। চোখের দৃষ্টি সদাই যেন সশঙ্ক। বার্বারা তাহাকে কোলে লইতে গেলে সে কাঁদিতে লাগিল; নিকোলা তাহার মাকে চিনিতে পারিল না, বার্বারার অবস্থাও প্রায় ঐরূপ।

ছেলের এই অবস্থা দেখিয়া রাগে, দুঃখে, ক্ষোভে সে টিন-মিস্ত্রির স্ত্রীকে বেশ দুকথা শুনাইয়া দিল। কিন্তু ঠিক ঐ সঙ্গে, নিকোলার গা মুছাইয়া দিতে দিতে তাহার মনিবদের ছেলের তুলনায় তাহার নিজের ছেলেকে কেমন অদ্ভুত কুৎসিত মনে হইতেছিল। এখন তাহার পক্ষে এই নোংরা ছেলেটাকে হাতে করিয়া মানুষ করা যে এক রকম অসম্ভব, তাহা সে বেশ বুঝিতে পারিল।

সে যাই হোক, মনিব-গৃহিণীকে বলিয়া, নিকোলাকে কালই হল্‌ম্যান্ ছুতারের বাড়ীতে রাখিবার বন্দোবস্ত করিতে হইবে, এ যদি সে না করে তবে তাহার নাম বার্বারা নয়।

সে কাঁদিয়া কাটিয়া মুখ-চোখ লাল করিয়া মনিব-বাড়ী গিয়া হাজির হইল এবং মনিব-গৃহিণী তাহার নিকোলা সম্বন্ধে নূতন বন্দোবস্তে রাজী হইলে তবে ঠাণ্ডা হইল।

এমনি করিয়া নিকোলার হল্‌ম্যান্ ছুতারের বাড়ীতে থাকাই সাব্যস্ত হইয়া গেল।

দুই

কষ্টে যাহাদের শিশুকাল কাটিয়াছে এবং আদর যাহারা যথেষ্ট পায় নাই, তাহাদের পক্ষে ছেলেবেলার কথা ভুলিয়া যাওয়াই মঙ্গল। শৈশবের ক্ষত সারিয়া ওঠে শীঘ্রই, কিন্তু দাগ ঘুচে না।

ছুতার-গৃহিণী বলে, "যে দিনই ছেলেটা এ বাড়ীতে পা দিয়েছে, সেই দিনই বুঝতে পেরেছি যে ও চোরের আড্ডায় মানুষ হয়েছে। ওর চারিদিকে চোখ। যখন কথা কইতে শেখেনি তখন থেকেই হাড়ে হাড়ে বজ্জাত, তখন থেকেই অবাধ্য। এই দেখলুম দিব্যি চুপচাপ করে ঘুমুচ্ছে—আর আমি যেই চোখ বুজিতি, অমনি চৌকীদারের মতো চেঁচাতে আরম্ভ করেছে। হাড়-পাজী, হাড়পাজী।"

হল্ম্যান্দের যাহারা জানিত তাহারা সকলেই একবাক্যে বলিত, "হল্ম্যান্দের পক্ষে ছেলেটাকে আশ্রয় দিয়ে লাভ না থাক, ছেলেটার লাভ আছে। এমন ঘরে ঠাঁই পাওয়া ভাগ্যের কথা।" ছুতার-গৃহিণীর কর্তব্যনিষ্ঠা সম্বন্ধে মতভেদ ছিল না। এই ঝরঝরে, খরখরে, মাছের চোখের মতো চক্ষুবিশিষ্ট, লম্বা ছিপছিপে স্ত্রীলোকটিকে দেখিলেই মনে হয়, ভাবের আতিশয্যে লাভ-লোকসানের কথা ভুলিয়া যাইবার পাত্র সে একেবারেই নয়।

বার্বারা বৎসরে যে দুই-চার বার নিকোলাকে দেখিতে আসিত—(এখন তাহার পক্ষে ইহার বেশি আসা দুর্ঘট, কারণ ভৌর্গ্যাং-পরিবার এখন প্রায়ই শহরের বাহিরে বাহিরে হাওয়া খাইয়া বেড়ায়)—প্রত্যেক বারেই সে দেখিতে পাইত, নিকোলা ক্রমশঃ হৃষ্টপুষ্ট হইয়া না উঠুক অন্ততঃ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন অবস্থায় আছে। সে যতক্ষণ হল্ম্যানের বাড়ী থাকিত ততক্ষণই কেবল নিকোলার একগুঁয়েমি এবং দুষ্টুমির ইতিহাস ছুতার-গৃহিণীর মুখে শুনিত। টিন-মিস্ত্রির ঘরে থাকিয়া, অকেজো টিনের চাদরের মতো নিকোলার স্বভাবটা নাকি একেবারে বাঁকিয়া তেউড়িয়া গিয়াছে।

সে বেশ হাঁটিতে পারে, অথচ কেমন যে স্বভাবের দোষ—এখনো হামা দিয়াই চলিবে। এদিকে আবার, হল্ম্যান্-গৃহিণী একটু পাশ ফিরিয়াছে কি অমনি একটা না একটা কাণ্ড বাধাইয়া বসিয়াছে। হয় জল ঘাঁটিতেছে, নয় পেয়ালা-সানকির গোছা ধরিয়া টানিতেছে, না হয় সদরে ঘণ্টার দড়িটা

ছিঁড়িয়া রাখিয়াছে। বিড়ালের খাবার প্রায়ই তো বাটিসুদ্ধ উল্টাইয়া রাখে। কাজেই বাধ্য হইয়া বেতগাছটাকেও নীচু করিয়া চোখের সাম্‌নে ঝুলাইয়া রাখিতে হইয়াছে। কারণ এখন হইতে ভয় না দেখাইলে এ ছেলে একেবারে দুর্দান্ত হইয়া উঠিবে। পরের ছেলে মানুষ করিয়া তোলা যে কি বিষম ব্যাপার তাহা অন্ততঃ বার্বারার বুঝিতে পারা উচিত।

মনে যতই ব্যথা লাগুক, বার্বারা এ সমস্ত কথার কোনো জবাব খুঁজিয়া পাইত না। কাজেই সে ছুতারের ঘরে, নিজের ছেলেকে দেখিতে আসিয়াও, বেশিক্ষণ বসিতে চাহিত না। অপ্রিয় কথা উঠিলেই ছুতা করিয়া নিজেই উঠিয়া পড়িত। হল্‌ম্যান্‌দের সংস্পর্শে আসিয়া তাহার এক বিষয়ে একটু উপকার হইয়াছিল। সে অনেক চোখা চোখা কথা শিখিয়াছিল; বর্তমান মনিবের সঙ্গে কোনো কারণে বনিবনাও না হইলে, তাহার পক্ষেও যে বলিবার কথা অনেক আছে, ছুতার-গৃহিণীর দৃষ্টান্তে সে তাহা বেশ ভাল করিয়াই শিখিয়াছে।

এদিকে নিকোলার বয়স বাড়িতে লাগিল, কিন্তু একগুঁয়েমি কমিল না। হল্‌ম্যান্‌-গৃহিণীর মুষ্টিপ্রয়োগের সঙ্গে সময়ে সময়ে হল্‌ম্যান্‌কেও যোগ দিতে হইত। সে বেচারা সহজে এই দুশ্চিকিৎসায় রাজী হইত না; গৃহিণীর গঞ্জনা যখন নিতান্ত অসহ্য বোধ হইত, কেবল তখনি নিঃসহায় নিকোলার পৃষ্ঠে দুই-চারিটা চড়-চাপড় মারিত। এ কাজটা ক্রমশঃ গৃহিণীর গৃহকর্মের অন্তর্গত বলিয়া তাহার মনে হইতে লাগিল। সুতরাং নিকোলার নিগ্রহ হল্‌ম্যানের অভিধানে গৃহিণীর গৃহকর্মের সহায়তার নামান্তর হইয়া পড়িল।

হল্‌ম্যান্‌ লোকটি নিরীহ, অল্পভাষী। সে রোজ সকালে কাজে যাইত এবং বৈকালে মন্থর গতিতে বাড়ী ফিরিত। দরজার কাছে আসিয়া, জুতা ঝাড়িয়া কেমন যেন একটু ইতস্ততঃ করিয়া বাড়ী ঢুকিত। নিজের বিবাহিত জীবন সম্বন্ধে তাহার যে কি ধারণা, তাহা হল্‌ম্যানের মুখ দেখিয়া বুঝিবার জো ছিল না। তবে এই পর্যন্ত বলা যায় যে, গৃহিণী হিসাবে শ্রীমতী হল্‌ম্যান্‌ একখানি অমূল্য রত্ন, উহাকে মাথায় করিয়া রাখিলেও উহার যথেষ্ট মর্যাদা করা হয় না।

গরীয়সী গৃহিণীর শ্রেষ্ঠত্বের বিষয় নিত্য নিয়ত ভাবিতে ভাবিতে বেচারা হল্‌ম্যানের বুদ্ধি-শুদ্ধি প্রায় লোপ পাইবার মতো হইয়া উঠিয়াছিল। অথচ এ বিবাহে যে এই রকম হওয়াটাই স্বাভাবিক—গৃহের শান্তিরক্ষার পক্ষে অনিবার্য তাহা দুজনেই বেশ জানিত। শ্রীমতী হল্‌ম্যান্‌কে একবার দেখিলেই কিংবা

একবার উহার সঙ্গে বাক্যালাপ করিলেই এ ব্যাপারটা বোঝা শক্ত হইবে না। হল্‌ম্যান্ নিজের রোজগারের টাকায় সংসার চালায় অথচ কেমন করিয়া এমন হয় ইহার মধ্যে এইটুকুই বোঝা কঠিন।

পত্নীভাগ্য যাহার এমন অনন্যসাধারণ, সে যে মাঝে মাঝে বে-একতিয়ার অবস্থায় বাড়ী ফেরে—এই ব্যাপারটাই পাড়ার লোকের কাছে আবার সর্বাপেক্ষা দুর্বোধ্য।

নিকোলাকে পালন করিবার ভারগ্রহণের কয়েক বৎসরের মধ্যেই হল্‌ম্যান্ ছুতারের ঘরে এক দৈবঘটনা ঘটিল, বুড়া বয়সে ছুতার-গৃহিণী একটি কন্যা সন্তানের জননী হইল। সুতরাং পরের ছেলেকে আর বেশিদিন ঘরে স্থান দেওয়া উচিত কি না, ইহা লইয়া স্ত্রীপুরুষে তর্ক চলিতে লাগিল। শেষে নিয়মিত মাসহারার মোহই জয়ী হইল। স্থির হইল, নিকোলা যেমন ছিল তেমনি থাকাই ভাল; তাহাকে খুকীর সেবায় লাগানো যাইবে। সে বসিয়া থাকে,—না হয় খুকীর দোলার দড়িটা ধরিয়া মাঝে মাঝে দোল্ দিবে। খুব হাল্কা কাজ, ছোট ছেলেদের ঠিক উপযুক্ত কাজ, একটু শিখিলেই বেশ পারিবে। কিন্তু ছুতার গৃহিণীর এই ন্যায্য আশাও ঠিক পূর্ণ হয় নাই: এই হাল্কা কাজেও নিকোলার গাফিলি। গৃহিণী কার্যান্তরে যাইবার সময় নিকোলাকে দোলার কাছে রাখিয়া যাইত, কিন্তু ফিরিয়া আসিয়া দেখিত, নিকোলা জানালায় দাঁড়াইয়া হাঁ করিয়া রাস্তায় ছেলেদের খেলা দেখিতেছে। সময়ে সময়ে বেচারা দরজা খোলা রাখিয়া একেবারে রাস্তায় নামিয়া দাঁড়াইয়া আছে, এমন ব্যাপারও ছুতার-গৃহিণী দেখিয়াছে। এমন অসাবধান! লক্ষ্মীছাড়া পরের ছেলেটার হাড় কয়খানা গুঁড়াইয়া না দিলে উহার চৈতন্য হইবে না।

নিকোলার আর্ত চীৎকারে অতিষ্ঠ হইয়া যখন উপরতলার ভাড়াটিয়াদের ঝি মুখ বাড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাগা, আজ আবার কি হয়েছে? ছেলেটা অমন করে কাঁদছে কেন?" তখন ক্ষণকালের জন্য হাত বন্ধ রাখিয়া ছুতার-গৃহিণী মুখ খুলিয়া দিল। সে বলিল, পরের কথা, পরের দরদ তাহার ভাল লাগে না; অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। পরের জ্বালায় সে জ্বালাতন, সে হতভাগাটাকে ঘরে বন্ধ রাখিয়া দেখিয়াছে, উহাকে খাইতে না দিয়া দেখিয়াছে, বকিয়া দেখিয়াছে, মারিয়া দেখিয়াছে—কিছুতেই ছোঁড়া বাগ মানে না। কোনো কাজের ভার দিয়া যদি নিশ্চিন্ত হইবার জো আছে। যে একগুঁয়ে সেই।

ইহার পর ছুতার-গৃহিণী এক নূতন ফিকির আবিষ্কার করিল। সে

নিকোলাকে ভূতের ভয় দেখাইয়া দোলা ছাড়িয়া যাইতে বারণ করিয়া দিল। সে বলিয়া রাখিল, "ত্থাখ, ঐ মশারির চালে শয়তান বসে আছে, তুই কি করিস্ না করিস্, দোলা ছেড়ে উঠিস্ কি না উঠিস্, সে সব দেখতে পায়।"

বেচারা ছেলেমানুষ ভয়ে আর হাতপা নাড়িতে পারিত না। বাতাসে মশারি নড়িলেই, তাহার মনে হইত শয়তান মাথা তুলিয়া তাহাকে দেখিতেছে। মাঝে মাঝে বাহিরের কলরবে সে জানালায় না গিয়া থাকিতে পারিত না। কিন্তু যেমনি শয়তানের কথা মনে পডিত, অম্‌নি এক দৌড়ে নিজের জায়গায় গিয়া জড়সড় হইয়া বসিয়া থাকিত।

যখন দোলা দিবার প্রয়োজন ফুরাইল, তখন নিকোলা হল্‌ম্যান্-কন্যা উর্সিলাকে খেলা দিবার এবং চোখে চোখে রাখিবার চাকরি পাইল। এদিকে কিন্তু রাস্তায় পা দিবার হুকুম ছিল না। হল্‌ম্যান্-গৃহিণী আগে হইতে খুব শাসাইয়া রাখিয়াছে, নিকোলা এখন আর সাহস পায় না। সে গৃহিণীর নিষেধ না মানিয়া দেখিয়াছে, নিকোলা ঠেকিয়া শিখিয়াছে। এখন তাহার পক্ষে নিষেধ মাত্রেই লোহার বেড়ি এবং বেতের বেড়ার সমান হইয়া উঠিয়াছে। গণ্ডীর বাহিরে পা দেওয়া তাহার পক্ষে এখন সকলের চেয়ে গুরুতর পাপ। শ্রীমতী হল্‌ম্যান্‌কে ধন্যবাদ! এই রকম না করিলে ছেলেটা কোন্ দিন বিপদ ঘটাইয়া বসিত; রাস্তায় ছেলেদের সঙ্গে খেলায় মত্ত হইয়া অসাবধানে মেয়েটাকে এতদিন হয় গাড়ী চাপা দিয়া, নয় তো সরকারী কুয়ায় ডুবাইয়াই মারিত।

উর্সিলা যে তাহার নিজের চেয়ে উচ্চ শ্রেণীর জীব, নিকোলার এই রকম একটা ধারণা জন্মিয়া গিয়াছিল। উর্সিলাকে লোকে এক চোখে দেখে, নিকোলাকে দেখে আর এক চোখে; ইহা সে বরাবর দেখিয়াছে।

যদিও উর্সিলার জন্য সে অনেক সহ্য করিয়াছে, তবু কতকটা—বোধ হয় উহার জন্য অতটা সহিয়াছে বলিয়াই—উর্সিলাকে নিকোলার আপনার বলিয়া মনে হইত। উর্সিলার উপর উহার একটা আকর্ষণ জন্মিয়াছিল। কথাটা নূতন ঠেকিতে পারে কিন্তু কথাটা খাঁটি। উর্সিলার সকল ভার যে তাহারই উপর ন্যস্ত, এই ভাবটা ক্রমশঃ তাহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াছিল, সে উহাকে আশ্চর্য রকম ভালবাসিত; শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিত বলিলেও ভুল হয় না। যখন হল্‌ম্যান্-গৃহিণী উর্সিলাকে নীল রঙের ঘাগরা এবং ফুলদার টুপি পরাইয়া দিতেন, তখন নিকোলার মুখে হাসি ধরিত না। নিকোলা ক্ষুদ্র উর্সিলার কোনো কথায় 'না' বলিতে পারিত না। উর্সিলার হুকুম সে হল্‌ম্যান-গৃহিণীর হুকুমের

চেয়ে কম জরুরি মনে করিত না। উর্সিলা মুঠি মুঠি ধূলা নিকোলার মাথায় দিত, নিকোলা হাসিয়া কুটিকুটি হইত। এইরূপ খেলিতে খেলিতে বালিকা বাহানা করিয়া জুতা-জামা খুলিয়া দিতে বলিত। যদি নিকোলা তাহার কথা শুনিয়া খুলিয়া দিল, তবে বাড়ীতে তাহাকে প্রহার খাইতে হইত। আর যদি না দিল, তবে উর্সিলা কাঁদিয়া কাটিয়া এমনি অনর্থ করিত যে, তাহাকে অকারণে কাঁদানোর অপরাধে নিকোলা সেই প্রহারই লাভ করিত।

নিকোলা অনির্ভরের উপর ভর করিয়াছিল, সংশয়ের মাঝখানে বাস করিতেছিল। সে চোরকুঠরির দিকে এমনি ভয়চকিত ভাবে চাহিতে অভ্যস্ত হইয়াছিল যে, ঐ জিনিসটা নজরে পড়িলেই, কোনো দোষ না করিলেও নিজেকে তাহার দোষী বলিয়া মনে হইত। তাহার বাল্য-জীবন এই ভাবেই গড়িয়া উঠিয়াছে।

ছুতার-গৃহিণী বলিত, "ও যে পাজী তা' ওর চোখ দেখেই বোঝা যায়।" কথাটা মিথ্যা নয়, পাছে কিছু অন্যায় করিয়া ফেলে এই ভয়ে নিকোলার দৃষ্টি সদাই শঙ্কিত।

শাস্ত্রে বলে, "সৎপ্রতিবেশী ভগবানের শ্রেষ্ঠ দান।" বর্তমান যুগে প্রতিবেশীই নাই, তা সৎ আর অসৎ। আমরা কেহ কাহারও-প্রতিবেশী নই। নীচের তলার ভাড়াটিয়া উপর তলার ভাড়াটিয়াকে চিনে না, এ বাড়ীর লোক ও বাড়ীর লোকের খোঁজ রাখে না। সুতরাং নিকোলার নির্যাতনে কেহ বড় একটা কথা কহিত না। প্রতিবেশীর নূতন পিয়ানো-শিক্ষা যেমন করিয়া বরদাস্ত করা যায়, ইহারা তেমনি করিয়া নিকোলার চীৎকার সহ্য করিত। এমন হতভাগা ছেলেকে যে শুধরাইবার অন্ততঃ চেষ্টাও হইতেছে, এজন্য হয়তো কেহ কেহ বা মনে মনে খুশীই ছিল। নিকোলা ও উর্সিলা এক সঙ্গে বাড়ীর সম্মুখে ফুটপাথের উপর পায়চারি করিত; লোকে উর্সিলাকে বন্ধু ভাবে 'গুড্‌মর্নিং' বলিত; কিন্তু নিকোলাকে ঐ রকম কিছু বলা তাহারা নিতান্ত অনাবশ্যক মনে করিত।

হল্‌ম্যানেরা যে বাড়ীতে ভাড়াটিয়া ছিল, রাঁধুনি মারীন্‌ সম্প্রতি ঐ বাড়ীর একটা ঘরে উঠিয়া আসিয়াছে। সে ধর্মিষ্ঠা ছুতার-গৃহিণীর কর্তব্যনিষ্ঠ চরিত্রের কোনো খবর রাখিত না, সুতরাং সে এমন একটা কাজ করিয়া বসিল যাহা শ্রীমতী হল্‌ম্যানের মতে অনধিকার চর্চা। মারীন্‌ অনভিজ্ঞ, সুতরাং তাহাকে মার্জনা করা যাইতে পারে।

স্থূলাঙ্গী মারীন্ একদিন সন্ধ্যাবেলায় লণ্ঠন হাতে কাঠকয়লা কিনিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বোঝাই নৌকার মতো হেলিয়া দুলিয়া সিঁড়ি দিয়া উঠিতেছে, এমন সময় সিঁড়ির নীচে অন্ধকার চোরকুঠরির দিক হইতে একটা কান্নার আওয়াজ তাহার কানে পৌঁছিল। তাহার মনে হইল যে লোকটা ফোঁপাইতেছে, তাহার কাঁদিয়া কাঁদিয়া যেন গলা ধরিয়া গিয়াছে, আর যেন স্বর বাহির হইতেছে না—যেন দম বন্ধ হইয়া আসিতেছে। ক্ষীণকণ্ঠের ভাঙা আওয়াজে মারীনের মন গলিয়া গেল, সে স্থির থাকিতে না পারিয়া লণ্ঠনের আলোকে শব্দের অনুসরণ করিয়া চোরকুঠরির সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। রুদ্ধ দ্বারের দিকে ঝুঁকিয়া মারীন্ জিজ্ঞাসা করিল, "ভিতরে কে গা? ঘরের ভিতর কে কাঁদে?"

হঠাৎ কান্নার শব্দ একেবারে নিস্তব্ধ হইয়া গেল।

মারীন্ দরজায় ধাক্কা দিতেই ভিতর হইতে একটা চীৎকারধ্বনি উঠিল। মারীন্ আলো নামাইয়া শিকলটা খুলিয়া ফেলিল।

"আরে! এই অন্ধকারে এমন জায়গায় এই কচি ছেলেটাকে কে শিকল দিয়ে গেছে?" লণ্ঠনের আলোকে মারীন্ দেখিল, নিকোলা সভয়ে তাহারই দিকে ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া আছে।

"ও! তুমি! মারীন্! আমি বলি শয়তান। শয়তান অমনি করে দরজায় ধাক্কা দেয়!"

"তোর 'ভুতুড়ে' কথা রাখ্, বাছা! এখনো আমার বুকের ভিতর কাঁপছে।"

"আমাদের গিন্নী বলে, তাই বলছি।" হঠাৎ নিকোলা ঔৎসুক্যের সঙ্গে মারীন্‌কে জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁগা, গিন্নী যা বলে সে কি সব সত্যি? না, আমি চিনির ঠোঙায় হাত দেব বলে আমায় ঐ সব বলে ভয় দেখায়?"

"ও! তাই বুঝি তোকে আট্‌কে রেখেছে?"

"না গো না, আমি চুরি করি নি; কিছু নিলেও বলে চুরি করিচি, না নিলেও বলে চুরি করিচি। এইবার থেকে সব খেয়ে টেয়ে শেষ করে রাখব। দেখনা, এই দেখনা, সেদিন কাঁচের বাটির ঢাকনিতে একটুখানি চিনি লেগেছিল, সেইটুকু আমি জিবে দিইছিলুম, তা' আমাকে ঠাস্ করে এক চড় বসিয়ে দিলে। এইবার থেকে লুকিয়ে সব শেষ করে রাখব, মজা দেখতে পাবে।" নিকোলা রাগে গন্-গন্ করিতে করিতে বলিল, "সব খেয়ে রাখব, চুরি করে খেয়ে রাখব, টেরটি পাবে।"

হঠাৎ মারীনের কাপড় ধরিয়া নিকোলা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "ওগো তুমি থাক, তুমি যেয়ো না, আমার অন্ধকারে বড় ভয় করে। অন্ধকার হলেই শয়তান আসবে। যেয়ো না ; থাক।"

মারীন্ ভারি মুশকিলে পড়িল, সে দাঁড়াইয়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিল ; নিকোলাকে ছাড়িয়া দিতে তাহার সাহস হইল না। সে নিকোলার হইয়া না হয় ছুতার-গৃহিণীকে দু'কথা বলিবে।

নিকোলা বলিল, "না, না, তুমি কিছু বলতে যেয়ো না, তা হলে আবার আমায় মারবে।"

তবে আর উপায় কি? মারীন্ এই কচি ছেলেকে অন্ধকারে একলা ফেলিয়া যাইতে পারিবে না। সুতরাং ভবিষ্যতের ভাবনা না ভাবিয়া সে নিকোলাকে বলিয়া ফেলিল, "আচ্ছা, তবে আয় আমার সঙ্গে, আজ রাত্তিরটা আমার ঘরেই ঘুমুবি ; কেমন ?"

এবার নিকোলা হল্‌ম্যান্-গৃহিণী কি বলিবে সে বিষয়ে চিন্তা না করিয়াই একেবারে দুই হাতে মারীনের বস্ত্রপ্রান্ত চাপিয়া ধরিল। মারীন্ নিকোলাকে লংবোটের মতো পিছনে বাঁধিয়া মন্থর গতিতে জাহাজের মতো বন্দরে ফিরিল।

তোরঙ্গ খুলিয়া মারীন্ তাহার পুরানো গরম কাপড়গুলি বাহির করিয়া, বেঞ্চির উপর বিছাইয়া নিকোলাকে শুইতে দিল। আনন্দে বালক তাহার সকল দুঃখ ভুলিয়া গেল। তাহাকে এমন যত্ন কেহ কখনো করে নাই।

তাহা ছাড়া এই রাঁধুনির ঘরের দেয়ালে কত নূতন জিনিস্, কত চক্‌চকে টিনের বাসন। আবার একটা বিড়ালও আছে, এ বিড়ালটাকে সে কতবার দেখিয়াছে, কিন্তু এ যে মারীনের তাহা সে জানিত না। সে গুড়ি মারিয়া বিড়ালটাকে ধরিতে গেল। ঐ যা, টেবিলে ধাক্কা লাগিয়া কেট্‌লিটা উল্‌টিয়া পড়িয়া গেল। ভয়ে নিকোলা ঘর ছাড়িয়া পালায় আর কি! কিন্তু কি আশ্চর্য! মারীন্ তো তাহাকে ধমক দিল না, মারিতেও গেল না। এ ভারি আশ্চর্য! নিকোলা ঐ চক্‌চকে টিনের বাসনগুলা দেখিয়াও এত আশ্চর্য হয় নাই, মারীনের ঘরে বিড়ালটাকে দেখিয়াও না।

বাতের ব্যথায় অনেকক্ষণ ধরিয়া এপাশ ওপাশ করিয়া অবশেষে মারীন্ ঘুমাইয়া পড়িল। সহসা একটা চীৎকার শব্দে সে জাগিয়া উঠিল।

"কি ? কি ? কি হয়েছে ? নিকোলা ! নিকোলা !" মারীন্ তাড়াতাড়ি পোড়া বাতির মুড়াটুকু জ্বালিয়া দেখে, নিকোলা উঠিয়া বসিয়া হাত-পা ছুড়িতেছে। ঝাঁকানির চোটে ঘুম যখন ভাল করিয়া ভাঙিল তখন বেচারা কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, "ওরা আমায় কাটতে এসেছিল।"

নিকোলাকে ঠাণ্ডা করিয়া বাতি নিবাইয়া, পুনর্বার ঘুমের আয়োজন করিতে করিতে মারীন্ ভাবিতেছিল, তাহার যে সন্তান হয় নাই সেজন্য সে খুব খুশী আছে, মাথার উপর কোনো ঝুঁকি নাই। তবে একটা না একটা জ্বালা মানুষ মাত্রেরই আছে, এই দেখ না, যার সন্তানের জ্বালা নাই সে বাতের ব্যথায় কষ্ট পায়।

পরদিন সকালে যখন হল্ম্যান্-গৃহিণী মারীন্‌কে তাহার অনধিকার চর্চার জন্য বাড়ীসুদ্ধ লোকের সম্মুখে দশ কথা শুনাইয়া দিল, তখন মারীন্ অপরাধীর মতো একেবারে চুপ করিয়া রহিল। নিকোলার দৌরাত্ম্যে হল্-ম্যান্‌দের প্রত্যেককে প্রত্যহ যে কি যন্ত্রণা ভুগিতে হয় এবং কি জন্য যে উহাকে প্রতিদিনই শাস্তি দিতে হয়, হল্ম্যান্-গৃহিণী তাহা এমনি করিয়া বর্ণনা করিল যে কাহারো আর বাক্যস্ফূর্তি হইল না। শ্রীমতী হল্ম্যান্ সব সহিতে পারে, কেবল সংসারে বিশৃঙ্খলা সহিতে পারে না, বেচাল দেখিতে পারে না! তাহার কাছে থাকা সত্ত্বেও কাহারও অশিষ্ট স্বভাব ঘোচে নাই—এর চেয়ে নিন্দার কথা সে কল্পনাও করিতে পারে না।

সেই দিন সন্ধ্যাবেলায় নীচের তলায় কাঠ কাটিতে কাটিতে মারীন্ যখন হল্ম্যান্‌দের ঘর হইতে নিকোলার কান্নার শব্দ শুনিতে পাইল, তখন আর তাহার উপরে যাইতে পা উঠিল না। যতক্ষণ কান্নার শব্দ শুনিতে পাইল, ততক্ষণ বেচারা নীচেই রহিল। সে এমন করুণ কান্না আর কখনো শুনিয়াছে বলিয়া তাহার মনে হয় না। শাস্তি, সুবিচারের ফলেই হোক আর অবিচারের ফলেই হোক, মারীন্ কান্না সহিতে পারে না।

ক্রমশঃ মারীনের ঘর নিকোলার আশ্রয়ের বন্দর হইয়া উঠিল। শাসনের ঝড়ে সে অনেক সময় এইখানে লুকাইয়া বাঁচিয়া যাইত। সে ইঁদুরটির মতো এক কোণে বসিয়া ছুরি দিয়া কাঠের ছোট ছোট নৌকা কুঁদিত। হল্ম্যান্‌কে টিফিন খাওয়াইতে গিয়া সে প্রায়ই এই সব অকেজো কাঠের টুকরা কুড়াইয়া আনিত।

নিকোলার শিশুজীবন যে নিছক নিরানন্দেই কাটিয়াছে, একথা বলিলে

কিন্তু একটু অত্যুক্তি হইবে। নিকোলা হল্‌ম্যান্-গৃহিণীর কাছে যেমন প্রহার খাইয়াছে, মাঝে মাঝে তেমনি প্রশংসাও পাইয়াছে। অবশ্য সে প্রশংসা ঠিক তাহার নিজের প্রশংসা নয়, তাহার নৈতিক উন্নতির জন্য ছুতার-গৃহিণী স্বয়ং যে কি পরিশ্রমটাই করিয়াছেন তাহারই প্রশংসা।

ছয় মাস অন্তর নিকোলার খরচের জন্য হল্‌ম্যান্-পত্নীকে কৌঁসুলী সাহেবের বাড়ী যাইতে হইত। নিকোলা কি ছিল এবং তাহার যত্নে কি হইয়া উঠিয়াছে, সে বর্ণনাটাও সেই সময়েই হইত। কৌঁসুলী সাহেবের যে গাড়ীখানা করিয়া হাটের জিনিস যাইত, মাঝে মাঝে নিকোলাও সেইটাতে চড়িয়া মার সঙ্গে দেখা করিতে যাইবার ছুটি পাইত।

যেদিন সে মার কাছে যাইত, সেদিন পূর্বাহ্ণে, হল্‌ম্যান্ গৃহিণী তামার পাত্র যেমন তেঁতুল দিয়া, বালি দিয়া মাজিয়া ঘষিয়া লাল করিয়া তোলে, তেমনি নিকোলাকেও মাজিয়া ঘষিয়া লাল করিয়া তুলিত। সে যতক্ষণ গাড়ীতে থাকিত গাড়োয়ানকে প্রশ্নের উপর প্রশ্নে বিব্রত করিয়া তুলিত। সেদিন আর তাহার মুখের একদণ্ড বিশ্রাম থাকিত না। সকলের চেয়ে কৌঁসুলী সাহেবের কালো ঘোড়াটাই নিকোলার কাছে কৌতূহলের সামগ্রী ছিল। সেইটাই সাহেবের সব চেয়ে ভাল ঘোড়া? না, ইহার চেয়েও ভাল ঘোড়া আছে? সে কি রেলগাড়ীর চাইতে জোরে চলে? না, রেলগাড়ী তার চেয়ে জোরে চলে? সে কাহার চাইতে এবং কিসের চাইতে আগে যাইতে পারে?...ইত্যাদি ইত্যাদি।

তারপর গাড়ী মোড় ফিরিয়া একেবারে কৌঁসুলী সাহেবের রন্ধনশালার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইত। ইস্! ঘোড়াটা কি শীঘ্রই দৌড়ায়।

তারপর একজন চাকর আসিয়া নিকোলাকে ঘরের পর ঘরের ভিতর দিয়া তাহার মার কাছে লইয়া যাইত।

"ওরে, ওর জুতোয় কাদা, জুতোয় কাদা, বলি, তোদের কি একটুও কাণ্ডজ্ঞান নেই? ওকে ঐ কাদা পায়ে এখানে এনে হাজির করেছিস্?" বার্বারা নিকোলাকে উঁচু করিয়া তুলিয়া একেবারে একখানা চৌকীর উপর বসাইয়া দিল। রুটি, মাখন, দুধ প্রভৃতি খাইতে দিয়া বার্বারা চলিয়া গেল; যাইবার সময় বলিয়া গেল, "খাওয়া হলে এইখানে স্থির হয়ে বসে থেকো, আমি এখন লিজি আর লাড্‌ভিগের কাপড়ে সাবান দিতে চললুম।"

বার্বারা যাইতে না যাইতে লাড্‌ভিগ্ ও লিজি নিকোলার কাছে হাজির

বয়সে নিকোলা তাহাদের সমান। তাহারা নিকোলার সঙ্গে খেলিতে আসিয়াছে। মেয়েটির দুই হাতে দুইটা বড় বড় পোশাক-পরা পুতুল। ছেলেটি একটা মস্ত কাঠের ঘোড়া দড়ি বাঁধিয়া টানিয়া আনিয়াছে। অল্পক্ষণের মধ্যেই তাহারা ঘরের চারিদিকে ঘোড়দৌড় আরম্ভ করিয়া দিল। লাড্‌ভিগ্‌ ঘোড়ায় চড়িয়া বসিল, নিকোলা তাহার ঘোড়ার দড়ি ধরিয়া টানিতে লাগিল। অনেকবার টানিয়া শেষে নিকোলা নিজে একবার চড়িতে চাহিল, লাড্‌ভিগ্‌ নামিতে রাজী হইল না। নিকোলা দড়ি ফেলিয়া রাগ করিয়া লাড্‌ভিগের একটা পা ধরিয়া তাহাকে ঘোড়া হইতে ফেলিয়া দিল।

"হতভাগা, ঝির ছেলে, তোর এত বড় আস্পর্ধা ?"

"ঝির ছেলে ? তুমি ঝির ছেলে !" বলিয়া নিকোলা লাড্‌ভিগ্‌কে যেমন ধরিতে গেল, অমনি সে ছুটিয়া খাটের পিছনে দাঁড়াইয়া বালিশ ছুড়িতে লাগিল। গোলমাল শুনিয়া বার্বারা ছুটিয়া আসিল এবং নিকোলাকে খুব খানিক বকিয়া শেষে বলিল, "লিজি লাড্‌ভিগ্‌ যা' বলে তাই শুন্‌বি,বুঝেছিস্‌ ? ওরা হ'ল কৌঁসুলী সাহেবের ছেলে; ওদের গায়ে হাত তুলতে গিয়েছিস্‌ ? বুড়ো ছেলে লজ্জা করে না !"

তারপর লাড্‌ভিগ্‌কে কোলে বসাইয়া তাহার কোটের ধূলা ঝাড়িয়া আদর করিয়া বার্বারা বলিতে লাগিল, "এমন ছেলে কেউ দেখেনি ! এমন ভাল ছেলে কি আর হয় ? একটু বস, বাবা আমার, মাণিক আমার, দেখ দেখি, নতুন ইস্তিরি করা কলারটা একেবারে ভেঙ্গে ছাই ক'রে দিয়েছে। নিকোলা, লাড্‌ভিগের জামাটা ধর, আমি ওর কলারটা বদ্‌লে দিই।"

বার্বারার আদরে খুশী হইয়া লাড্‌ভিগ্‌ মারামারির কথা ভুলিয়া গেল এবং নিকোলাকে তাহার গির্জায় যাইবার নূতন পোশাক দেখাইবার জন্য বার্বারাকে দেরাজ খুলিতে বলিল।

নিকোলা অবাক হইয়া লাড্‌ভিগ্‌ ও লিজির জামা-কাপড় দেখিল, কত রকমের পুতুল দেখিল, বাজনা দেখিল, ছবি দেখিল। দেরাজ বন্ধ করিবার সময় বার্বারা বলিল, "ওরা আমার লক্ষ্মী বলে, শান্ত বলে এই সব পেয়েছে।"

এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া নিকোলা ভাবিতে লাগিল, "এরা নিশ্চয়ই খুব— খুব ভাল, সেই জন্যে এত সব খেলবার জিনিস পেয়েছে, আর সেই জন্যে" নিকোলার চক্ষে জল আসিতেছিল "আর সেই জন্যে আমার মা আমার চাইতে এদেরি বেশী ভালবাসে।" নিকোলার মন দমিয়া গেল।

দেখিতে দেখিতে তিনটা বাজিয়া গেল, কৌঁসুলী সাহেবকে কাছারী হইতে আনিবার জন্য যে গাড়ী শহরে যাইবে, নিকোলাকে সেই গাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিবার বন্দোবস্ত হইয়াছে। বার্বারা নিকোলাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিতে গেল, সঙ্গে সঙ্গে লিজি লাড্‌ভিগ্‌ও গেল। "শান্ত হয়ে থাকিস্, নিকোলা, বুঝেছিস্, দৌরাত্ম্যি করিস্‌নে। হল্‌ম্যান্‌রা যা বলে শুনিস্। দেখ, দেখ, অমন করে পা ঠুক্‌ছিস্ কেন, গাড়ীর বার্নিস যে সব চটে যাবে। কোথায় পা রাখলে, দেখ, ওরে গদিতে যে কাদা লাগবে। ওরকম চুলবুল্ করিস্‌নে, যতক্ষণ গাড়ীতে যাবি, চুপ্ করে বসে থাবি, নড়িস্ চড়িস্‌নে, বুঝিচিস্? লাড্‌ভিগ্ কেমন, লিগি কেমন, ওরা ত তোর মতন নয়, কেমন গাড়ীতে বসে যায়; না লাড্‌ভিগ্? না লিজি?" গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিল।

দিনটা ভালই কাটিয়াছিল, উপরন্তু আসিবার সময় নিকোলা একখানা বড় 'কেক্' উপহার পাইয়াছিল, সেটা খাইতেও চমৎকার, কিন্তু গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিবার কিছুক্ষণ পরে নিকোলা চোখের জল ধরিয়া রাখিতে পারিল না। সে সারাটা পথ কেবল কাঁদিল।

তার পরদিন সকালে নিকোলা যখন উর্সিলাকে বাড়ীর সম্মুখে টহলাইতেছিল, তখন হল্‌ম্যান্ গৃহিণী বাড়ীওয়ালীকে সম্বোধন করিয়া যাহা বলিতেছিল তাহার কিছু কিছু নিকোলার কানে গেল।

"ভাল বলতে হয় বই কি, খুব ভাল; আমরা গরীব; বলতে গেলে, আমাদের পাঁচ পাতের কুড়িয়ে খেতে হয়, তাই আমরা ঠাঁই দিয়েছি। ভদ্রলোকের পক্ষে খুব আশ্চর্যি, নিজের ছেলেদের সঙ্গে একসঙ্গে বসতে দাঁড়াতে দেওয়া খুবই আশ্চর্যি। ছোঁড়ার ভাগ্যি; নইলে কোথাকার কে তার ঠিক নেই; বাপ নাকি বিবাগী হয়ে গেছে; ভগবান জানেন। লোকের কাছে তো মার পরিচয়েই ওর পরিচয়।"

পথের ধারে একটা মুরগীর মাথা পড়িয়াছিল, রাগে অপমানে নিকোলা সেটা জুতা দিয়া এমনি করিয়া মাড়াইল যে, সেটা একটা ডবল পয়সার মতো চেপ্টা হইয়া গেল।

ভূতের ভয় দেখাইয়া যখন আর কাজ হাসিল হইত না, তখন হল্‌ম্যান্-গৃহিণী নিকোলাকে পাঠশালায় পাঠাইবার ভয় দেখাইতে আরম্ভ করিল। উহার ধারণা পাঠশালাই ছেলে 'টিট্' করিবার একমাত্র প্রকৃষ্ট স্থান।

নিকোলার এ সম্বন্ধে ধারণাটা বেশ সুস্পষ্ট ছিল না। যে ভাবে কথাটা

পাড়া হইত, তাহাতে জায়গাটা যে অভাবনীয় রকম ভয়ানক, সে বিষয়ে তাহার সন্দেহ ছিল না।

শেষে সত্যই তাহাকে ইস্কুলে পাঠানো ঠিক হইয়া গেল। আগামী সপ্তাহে তাহাকে ভর্তি করিয়া দেওয়া হইবে।

বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রবি—নিকোলা গণিয়া দেখিল মোটে আর চারটি দিন বাকি। এই কয়দিন সে উর্সিলাকে—তাহার আদরের সিলাকে—একদণ্ডও কাছ ছাড়া করিবে না। দেখিতে দেখিতে কয়টা দিনই কাটিয়া গেল, এখন তাহার হাতে আছে কেবল রবিবারের সন্ধ্যাটা।

চায়ের সময় নিকোলা সিলার মুখে শুনিল যে, সে ইস্কুলে যাইবার দিন এক স্যুট নূতন কাপড় পাইবে। কথাটাতে সে যেন একটু সান্ত্বনা লাভ করিল। সে রাত্রে ঐ কথা ভাবিতে ভাবিতে বেচারা ঘুমাইয়া পড়িল।

সকালে কিন্তু নিকোলাকে আর খুঁজিয়া পাওয়া গেল না।

হল্‌ম্যান্-গৃহিণী কত খুঁজিল, উদ্দেশে কত লোভ দেখাইল, কত ভয় দেখাইল, কিন্তু কোনো মতেই নিকোলার সাড়া পাওয়া গেল না; সে একেবারে অন্তর্ধান করিয়াছে।

রন্ধন শেষ করিয়া মারীন্ ঘরে ঢুকিতে গিয়া হঠাৎ নিকোলাকে তাহার তক্তপোশের তল হইতে বাহির হইতে দেখিয়া চমকিয়া উঠিল। শেষে চিনিতে পারিয়া সে উহাকে কিছু খাইতে দিল এবং হল্‌ম্যান্‌দের কাছে ফিরিয়া যাইতে বলিল। নিকোলা কিন্তু অন্ধকার হইবার আগে ফিরিতে কিছুতেই রাজী হইল না।

যখন সন্ধ্যা হইয়া আসিল, তখন নিকোলা গুটিগুটি বাহির হইয়া পড়িল। নদীর কিনারা দিয়া চলিতে চলিতে একখানা খালি নৌকা তাহার চোখে পড়িল; সে সেইটার উপর চড়িয়া বসিল এবং সেটাকে খানিকক্ষণ দোলাইল। তারপর হেমন্তের কুয়াসার ভিতর দিয়া আসিয়া বান্-হাউসের তারের বেড়ায় ঠেশ দিয়া দাঁড়াইয়া দূর হইতে তাহার অনেক দিনের বাসগৃহের দিকে তাকাইয়া রহিল। হল্‌ম্যান্ দোকান হইতে ফিরিয়া আসিল এবং অভ্যাসমতো একটু ইতস্তত করিয়া ঘরে ঢুকিল। ঘরে আলো জ্বালা হইল, সিলা শুইতে গেল;—নিকোলা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সব দেখিতে লাগিল। সেই অন্ধকার বাড়ীর আলোকিত ক্ষুদ্র জানালা তাহার কাছে ক্রুদ্ধ ব্যক্তির রক্তচক্ষুর মতো ভয়ানক বোধ হইতেছিল। ঐখানে তাহার অমার্জনীয় অপরাধের শাস্তি উদ্যত হইয়া আছে, তাহা যেন সে স্পষ্ট দেখিতে পাইল।

তাহার পর আলো নিবিয়া গেল।

সেই দিন গভীর রাত্রে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টিতে, বান্‌-হাউসের চৌকিদার লণ্ঠন লইয়া সন্ধ-নামানো স্তূপাকার মালের চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া নিশ্চিন্তমনে আরাম করিতে গেল। সে নিকোলাকে দেখিতে পাইল না। অথচ বালক সম্মুখেরি কয়েকটা বস্তার আড়ালে—যেখানে জল-কাদার দিনে ব্যবহার্য কয়েকখানা তেরপল এবং লম্বা তক্তা জমা করা ছিল—সেইখানে লুকাইয়া হাঁটুর উপর মাথা রাখিয়া বসিয়া বসিয়া ঘুমাইতেছিল।

নিকোলা ঘুমাইয়া আপনাকে ভুলিয়াছিল, সব দুঃখ ভুলিয়াছিল, সে এক রকম নির্বাণ লাভ করিয়াছিল। এখন তাহার কাছে ইস্কুলের ভয় নাই, হল্‌ম্যান্‌-গৃহিণীর ভয় নাই,—সে এখন সকল ভয়ের অতীত; কারণ সে একে বালক, তাহার উপর সে নিদ্রাতুর।

এই একদিনের অভিজ্ঞতায় নিকোলা বুঝিল যে হল্‌ম্যানের বাড়ীর বাহিরেও তাহার আশ্রয় আছে। এখন হইতে সে এই কালো কালো তেরপলগুলিকে বন্ধুর চক্ষে দেখিতে লাগিল। হল্‌ম্যান্‌-গৃহিণীর তাড়াইয়া দিবার ভয় এবং তাড়নার ভয় তাহার কাছে আর আগেকার মতো ভয়ঙ্কর রহিল না।

সে যাহা হউক, ইস্কুলে তাহাকে ভর্তি হইতে হইল, কিন্তু সেখানে ছুতার-গৃহিণী-বর্ণিত বধমঞ্চের মতো প্রহারমঞ্চ বলিয়া কোনো জিনিস যে নাই, ইহা জানিয়া সে আশ্বস্ত হইল।

নূতন বুট জুতায় পা ঢোকানো যেমন কষ্টকর, প্রথম প্রথম নিকোলার কাছে লেখাপড়া শেখাও তেমনি কষ্টকর বোধ হইয়াছিল।

অনেক জিনিস সে বুঝিত, অনেক জিনিস বুঝিত না। যাহা সে না বুঝিত, তাহা হাজার বুঝাইলেও বুঝিত না। বরং উল্টা হইয়া যাইত, মাথার ভিতর সমস্ত গোলমাল হইয়া যাইত, কান্না আসিত। সে কেবল পিছাইয়া পড়িত, আবার ছুটির পর বন্ধ থাকিয়া পড়া মুখস্থ করিয়া কোনো রকমে হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিত। নিকোলার সহপাঠীদের মধ্যে অধিকাংশই কিন্তু বেশ ভাল ছেলের মতো সব মুখস্থ করিয়া ফেলিত। হায়! সবাই তাহার চেয়ে ভাল!

শাস্তিই পাক আর পড়াই না পারুক, বাড়ীর চেয়ে নিকোলার ইস্কুলই ভাল লাগিতে লাগিল। বাড়ীতে তাহার সন্ধ্যাটা আর কাটিতে চাহিত না; বিশেষ, সে পড়া করিতেছে কিনা দেখিবার জন্য হল্‌ম্যান্‌-গৃহিণী তাহার কাছেই

চোখ পাকাইয়া বসিয়া থাকিত ; সুতরাং সে সাহস করিয়া একটিবার সিলার দিকে চাহিতেও পারিত না, কথা কওয়া ত দূরের কথা।

হল্‌ম্যানের কথা ছাড়িয়া দাও, সে কিছু দেখিয়াও দেখিত না, শুনিয়াও শুনিত না। সে সেল্‌ভিগের দোকানে একটি চমৎকার ঔষধের সন্ধান পাইয়াছিল ; উহারই গুণে সে শ্রীমতী হল্‌ম্যানের সমস্ত তিরস্কার অক্লেশে পরিপাক করিতে সমর্থ হইত।

সে প্রত্যহ কাজ সারা হইলেই সেল্‌ভিগের দোকানে গিয়া হাজির হইত, কিন্তু ঘড়ির কাঁটা সাতটার কাছাকাছি হইলেই একেবারে দড়িছেঁড়া হইয়া বাড়ীমুখো ছুটিত। মদের দোকানে আসিয়াও হল্‌ম্যান্ ঘড়ি ধরিয়া চলিত বলিয়া অন্যান্য মাতালেরা উহাকে 'মিলিটারী ম্যান্' ও 'হু-কাম-দার' বলিয়া ঠাট্টা করিত।

তিন

গ্রামার স্কুলের গলি যেখানে বোর্ডিং স্কুলের রাস্তায় মিশিয়াছে, সে মোড়টি কোনো ছেলের পক্ষেই সুবিধার জায়গা নয়। এই জায়গাটাতে দুই স্কুলের ছেলেদের মধ্যে প্রায়ই মারামারি বাধিয়া যাইত।

লাড্‌ভিগ্‌ ভীগ্যাং, নীলের চামড়ার দপ্তর পিঠে ফেলিয়া এই পথ দিয়াই ইস্কুলে যায়। তাহার মাথা ছোট, ঘাড় লম্বা, নাক বাঁকা, চলনভঙ্গী অদ্ভুত; ছেলেরা তাহার নাম রাখিয়াছিল উটপাখী। ইস্কুলের পথে নিকোলার সঙ্গে তাহার প্রায়ই দেখা হইত, কিন্তু সে তাহাকে দেখিয়াও দেখিত না। নিকোলাও শিস দিতে দিতে, জুতার ঠোক্করে পথের বরফ ছড়াইতে ছড়াইতে চলিয়া যাইত।

নিকোলার সহপাঠীরা মিলিয়া তক্তা জুড়িয়া জুড়িয়া অনেক দিনের পরিশ্রমে একখানা ঠেলাগাড়ী তৈয়ার করিয়া তুলিয়াছিল। ইস্কুলের ছুটির পর উহারা প্রায়ই আনন্দে চীৎকার করিতে করিতে সকলে মিলিয়া ঐ গাড়ীটাকে রাস্তায় রাস্তায় টানিয়া লইয়া বেড়াইত। একদিন এমনি হুড়াহুড়ি করিয়া গাড়ীটা মোড় ফিরাইতেছে এমন সময়ে নিকোলার সঙ্গে ধাক্কা লাগিয়া ভিন্ন ইস্কুলের ছাত্র লাড্‌ভিগের হাত হইতে পেন্‌সিলের ঠুঙিটা পড়িয়া গেল। কলম, উড্‌পেন্সিল, শ্লেট পেন্সিল রাস্তাময় ছড়াইয়া পড়িল। "কুড়িয়ে দে কুকুর, কুড়িয়ে দে" বলিয়া লাড্‌ভিগ্‌ নিকোলাকে এক ধাক্কা দিল।

নিকোলা জবাব না দিয়া আল্‌গা বরফের উপর জুতার ঠোক্কর মারিল।

"এখনো বল্‌ছি কুড়িয়ে দে, নইলে আজই বাবাকে বলে তোকে ঠাণ্ডা করবার ব্যবস্থা করব; তুই যে এই সব বাপে-খেদানো মায়ে-তাড়ানো লক্ষীছাড়া ছোঁড়াদের সর্দার হয়ে উঠেছিস্‌, সে কথাও বলে দেব।"

"উটপাখীর নাকটা ধরে নেড়ে দেব নাকি?"

"একবার দেখ্‌না দিয়ে! আমরা টাকা দিই. তবে খেতে পাস্‌, তা জানিস্‌! আবার চোট! মার খাইয়ে, মাপ চাইয়ে তবে ছাড়ব। যার বাপের নেই খোঁজ তার আবার চোট। রাস্তার কুকুর! ঝির ছেলে!"

শেষ কয়টা কথা লাড্‌ভিগের মুখ হইতে বাহির হইতে না হইতে নিকোলা

রাগে পাগলের মতো হইয়া দুই হাতে ঘুষিবৃষ্টি করিতে লাগিল। সে বংশগত বৈষম্য ও অবস্থার তারতম্য কয়েক মিনিটের জন্য ভুলিয়াছিল; বলিল, "ডাক না এইবার বাপকে ডাক। বাপ-মা যে যেখানে আছে সক্কলকে ডাক।"

নিকোলার সহপাঠীরা এই দিনটাকে তাহাদের ইস্কুলের ইতিহাসে একটা স্মরণীয় দিন বলিয়া মনে করিত, কারণ ঐ দিনে লাড্‌ভিগের সঙ্গে সঙ্গে ভিন্ন ইস্কুলের সকল ছেলেই রণে ভঙ্গ দিয়া পলাইয়াছিল। এমন কি মারামারির পরদিনেও, টিফিনের সময়ে, তাহারা সকলে মিলিয়া, যে গ্যাস-পোস্টের কাছে মারামারি হইয়াছিল, সেইখানকার বরফে উটপার্গার নাক ফাটিয়া রক্ত পড়িয়াছে কি না, তাহারই চিহ্ন খুঁজিতে আসিয়া জটলা পাকাইয়া তুলিয়াছিল।

নিকোলা ইস্কুলের ছেলেদের কাছে দিগ্বিজয়ীর সম্মান পাইলেও ঘরে যে তাহার জন্য ভিন্ন রকমের অভ্যর্থনার ব্যবস্থা আছে, একথা সে বেশ বুঝিতে পারিয়াছিল। ভীর্গ্যাংদের বাড়ী হইতে হল্‌ম্যান্‌দের কাছে এতক্ষণ আর খবর আসিতে বাকী নাই।

বাড়ী যতই নিকট হইতে লাগিল, নিকোলার গতি ক্রমশঃ ততই মন্থর হইতে লাগিল। শেষে, তাহার সঙ্গীদের মধ্যে যে ছেলেটি সব চেয়ে তাহাদের পাড়ার কাছে থাকে, সেও যখন বাড়ী পৌঁছিল, তখন নিকোলা হঠাৎ রাস্তার মধ্যে একবার থামিয়া, এদিক ওদিক চাহিয়া যে গলির ভিতর ঢুকিয়া পড়িল, সেটা তাহার বাড়ী যাইবার রাস্তাই নয়।

এইবার লইয়া নিকোলা তিন রাত্রি বাড়ীর বাহিরে কাটাইল। শ্রীমতী হল্‌ম্যান্‌ চৌকিদারকে ঠিক এই কথাই বলিতেছিল, এজন্য যদি সে পুলিসের হাতে ঠ্যাঙানি খায় তো ভাল বই মন্দ হয় না। ভদ্রলোকের ছেলের গায়ে হাত তোলা! তাও আবার যে সে নয়, কৌন্সলী সাহেবের ছেলে—যাদের অন্নে জীবন!

আচ্ছা, এই বরফ, এই ঠাণ্ডা,—ছোঁড়াটা গেল কোথায়? বান্‌-হাউসের খোলা চত্বরে, হাজার তেরপল মুড়ি দিলেও তো এ শীত মানিবার নয়! নিকোলার গুপ্ত কেল্লার সন্ধান চট্‌ করিয়া বলিয়া ফেলা মোটেই সহজ কথা নয়। কারণ, সে বাড়ীর এত কাছে লুকাইয়াছিল যে, সে জায়গায় তাহার খোঁজ করিতে গেলে, নিজের জামার পকেটগুলাও একবার খুঁজিয়া হাতড়াইয়া দেখিতে হয়।

মরিবার ভয় থাকিলেও পতঙ্গ যেমন বাতি ছাড়িয়া দূরে যাইতে পারে না,

নিকোলাও তেমনি মার খাইবার ভয় সত্ত্বেও বাড়ীরই কাছে লুকাইয়া ছিল। হল্‌ম্যান্‌-গৃহিণীর গঞ্জনার ভয়ে সে বাড়ী গেল না, কিন্তু সিলার কাছ ছাড়া হইয়া বেশী দূরে যাইতেও তাহার মন সরিল না।

সেই রাত্রে শুইয়া শুইয়া নেশার ঝোঁকে হল্‌ম্যানের কেবলি মনে হইতেছিল—নিকোলার ব্যাপারটা কেমন যেন বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছে। বাহিরে বরফ গলিয়া রাস্তায় জল জমিয়াছে, মাঝে মাঝে সেই জল ভাঙ্গিয়া লোক চলিতেছে। হল্‌ম্যানের মনে হইতেছিল সেই গতিবিক্ষুব্ধ জল কেবলি বলিতেছে: নি—কো—লা! নি-ই-কো-ও-লা-আ!

বেচারা ছেলেমানুষ! ব্যায়রামে পড়িবে দেখিতেছি।

সমবেদনার আকস্মিক উত্তেজনায় হল্‌ম্যান্‌ কম্বল ফেলিয়া উঠিয়া বসিল। ছেলেটা গেল কোথায়? হুঁ! পোড়ো আস্তাবলে যে ভাঙা গাড়ীখানা কাপড় ঢাকা পড়িয়া আছে—তাহার ভিতর নাই তো!

হল্‌ম্যান্‌ বাহির হইয়া পড়িল।

নিকোলা অঘোরে ঘুমাইতেছিল। যখন সে জাগিল, তখন হল্‌ম্যান্‌ তাহার জামার কলার ধরিয়া বিড়ালছানার মতো উঁচু করিয়া তুলিয়াছে।

নিকোলা যে মুহূর্তে খাড়া হইয়া দাঁড়াইতে পারিল, সেই মুহূর্তেই অবস্থাটা বুঝিয়া লইল এবং ব্যাপার বুঝিয়া একেবারে সটান হইয়া শুইয়া পড়িল। সে পা ছুড়িতে লাগিল এবং চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল; কিছুতেই সে বাড়ী যাইবে না—মারিয়া ফেলিলেও না।

নিকোলা এমনি ক্ষেপিয়াছিল এবং পা ছুড়িতেছিল যে তাহার কথায় সন্দেহ করিবার বিন্দুমাত্রও অবসর ছিল না।

হল্‌ম্যান্‌ উহাকে একবার বাড়ীর ভিতর পুরিতে পারিলে হয়, চাবুকের চোটে সিধা করিবার লোক দরজায় দাঁড়াইয়া আছে।

হল্‌ম্যান্‌-গৃহিণী লণ্ঠন হাতে দাঁড়াইয়াছিল। তাহার আলোকে সে দেখিল নিকোলার ক্রুদ্ধ চোখ আগুনের মতো জলিতেছে, তাহার কচি মুখ একেবারে ফ্যাকাশে হইয়া উঠিয়াছে।

"যার ঘর নেই তার ঘরে দরকারও নেই, ছেড়ে দাও বলছি ছেড়ে দাও" —বলিতে বলিতে রোরুদ্যমান নিকোলা হঠাৎ এক ঝট্‌কায় হল্‌ম্যানের হাত ছাড়াইয়া, তীরের মতো ছুটিতে ছুটিতে ফটক পার হইয়া অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গেল।

নিকোলার ঘুষি যে কেবল লাড্‌ভিগের নাকে বাজিয়াছিল তাহা নয়, উহা বার্বারার বুকেও বাজিয়াছিল। কিন্তু যখন সে শুনিল, নিকোলা হল্‌ম্যান্‌দের ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে এবং শীঘ্রই তাহাকে 'সংশোধনাগার' নামে ছেলেদের জেলে পাঠাইবার কথা উঠিয়াছে তখন সে পুরা দমে কান্নাকাটি জুড়িয়া দিল। সে ছেলের জন্য অনেক দুঃখ সহিয়াছে, কিন্তু এ ধাক্কা সে সামলাইতে পারিবে না; ছেলে জেলে গেলে সে বাঁচিবে না। মনিব ঠাকুরাণীকে দয়া করিতেই হইবে, নিকোলার এ দুর্গতি কিছুতেই সে বরদাস্ত করিতে পারিবে না। বার্বারা রোজসহি করিয়া কাজ করে নাই, প্রাণ দিয়া খাটিয়াছে। লাড্‌ভিগ্ আর লিজিকে নিজের মতো করিয়া মানুষ করিয়াছে। তাহার এ অনুরোধ রাখিতেই হইবে। নহিলে, কি যে ঘটিবে, বার্বারা কি যে করিবে তাহা সে নিজেই জানে না; হয় তো তাহাকে বাধ্য হইয়া এ চাকরি ছাড়িয়া দিতে হইবে।

বার্বারা কাঁদিয়া কাটিয়া বাড়ীশুদ্ধ লোককে অস্থির করিয়া তুলিল। ছেলেরা পর্যন্ত তাহার কাছে ঘেঁসিতে সাহস পায় না।

এই রকম কান্নার পালা প্রায় একদিনের অধিক স্থায়ী হইত না, কিন্তু এবার তিন-চার দিনেও থামিল না। বাড়ীশুদ্ধ লোক বিরক্ত। ভীর্গ্যাং-গৃহিণীর মাথার অসুখ চাগিয়া উঠিল। অসুখের সময়ে তিনি গোলমাল সহ্য করিতে পারিতেন না। প্রায় সাধারণতঃ ঘুমাইলেই তাঁহার মাথা পরিষ্কার হইয়া যাইত।

এই রকম অসুখের সময় বার্বারাই গোলমাল থামাইয়া বেড়াইত, গৃহিণীর মহলে চৌকিদারী করিত, কিন্তু আজ সে নড়িল না; নিজের ঘরে একলাটি বসিয়া চোখের জল ফেলিতে লাগিল।

আজ, এই অসুখের সময়ে মনিব ঠাকুরাণী যে একবারও বার্বারাকে ডাকিলেন না ইহাতে সে মনে মনে একটু বিস্ময় বোধ করিতেছিল। আবার স্বয়ং মনিবও যে তাহার মেজাজ বুঝিয়া চলিতেছেন, ইহা ভাবিয়া সে একটু খুশীও হইয়াছিল।

সন্ধ্যা হইয়া গেল, ভীর্গ্যাং-গৃহিণী উঠিলেন না। কৌঁসুলী সাহেব বাড়ী আসিলে মাথায় শাল জড়াইয়া নিজেই প্রদীপ জ্বালিলেন, বার্বারাকে ডাকিলেন না। মানসিক উত্তেজনায় তাঁহার গলার আওয়াজ কাঁপিতেছিল।

ভবিষ্যতে মানাইয়া চলিতে না পারিলে বার্বারার যে এ বাড়ীতে চাকরি

করা পোষাইবে না, এ কথা ভীর্গ্যাং-গৃহিণী স্পষ্টাক্ষরে বার্বারাকে পূর্বাহ্ণেই জানাইয়া রাখিতে চান।

দাসীর মান-অভিমানের জ্বালায় বাড়ীসুদ্ধ লোক ব্যতিব্যস্ত। ছেলেদের মুখ চাহিয়া এতদিন গৃহিণী সমস্ত সহ্য করিয়া আসিয়াছেন, কোনো কথায় কথা কহেন নাই,—কর্তাও সে কথা জানেন, কিন্তু আর বরদাস্ত করা যায় না। তা' ছাড়া ছেলেরাও বড় হইয়া উঠিয়াছে, এখন বার্বারাকে ছাড়াইয়া দিলেও ক্ষতি নাই। গৃহিণীর মতে, এই সুযোগে বার্বারাকে বরখাস্ত করাই যুক্তিসঙ্গত, ছোটলোক ভারি বাড়িয়াছে।

সুতরাং এ বাড়ী হইতে শীঘ্রই যে বার্বারার অন্নজলের বরাৎ উঠিবে সে কথা তাহাকে সংযত অথচ স্পষ্ট ভাষায় জানাইয়া দেওয়া হইল। কৌসুলী-গৃহিণীর বন্ধু ও বান্ধবীমহলের সকলেই এক বাক্যে এই পাকা চালের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ঐ পেটমোটা আদুরে জীবটিকে যে আর বেশীদিন আদর দেওয়া চলিবে না, এ কথা তাঁহারা আগে হইতেই জানিতেন।

বিস্মিত হইল কেবল বার্বারা, বজ্র-গর্জন-বিমূঢ়ের মতো ব্যাপারটার মর্ম গ্রহণ করিতে তাহার বেশ একটু দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হইল। সে—ভীর্গ্যাং বাড়ীর বার্বারা—লিজি-লাড্‌ভিগের মাতৃস্থানীয়া—যে নহিলে একদণ্ড চলে না—সে লিজি-লাড্‌ভিগকে ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া যাইবে? তাহাকে ছাড়াইয়া দেওয়া হইবে? বার্বারার ইহা বিশ্বাস করিতে দেরী লাগিল।

বার্বারা একটু গম্ভীর হইয়া উঠিল; বিনা অপরাধে যে তাহাকে ছাড়িয়া যাইবার নোটিস্ দেওয়া হইয়াছে, ইহা সবাই বুঝুক,—উহার গম্ভীর হইবার কারণ অনেকটা এই রকম। ইহাতে কিন্তু ফল হইল না, মনিব ঠাকুরাণী গলিলেন না। বার্বারা মনে মনে ধূলির অধম হইয়া গেল। ইহার পর সে কত মিনতি করিল, কত কাঁদিল, কিন্তু মিষ্টভাষিণী ভীর্গ্যাং-গৃহিণীর ঐ এক কথা, ছেলেরা বড় হইয়াছে, এখন আর তাহাকে প্রয়োজন নাই। বার্বারা ছেলেদের অনেক করিয়াছে, সেজন্য গৃহিণী, কর্তাকে বলিয়া না হয় বিদায়ের পূর্বে তাহাকে কিছু পারিতোষিক দেওয়াইয়া দিবেন।

বার্বারা চটিল, সে শহরে যাইবার নাম করিয়া এক বেলার ছুটি চাহিয়া লইল। বার্বারা একবার ঘুরিয়া আসুক,—তখন মনিব ঠাকুরাণী বুঝিবেন। শরীরের রক্ত দিয়াও যাহাদের মন পাওয়া যায় না, বার্বারা তাহাদের চাকরি ছাড়িয়াই দিবে, সে অন্যত্র কর্মের চেষ্টা দেখিবে।

বার্বারা প্রথমেই ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের বাড়ীতে গিয়া উঠিল। উঁহারা একজন ছেলের ঝি খুঁজিতেছিলেন। তাহার উপর ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব কৌসুলী সাহেবের বন্ধু মানুষ, সুতরাং বার্বারাকে আর পরিচয় দিয়া ভর্তি হইতে হইবে না, তাঁহারাই বার্বারাকে লুফিয়া লইবেন। এই গত রবিবারেও কৌসুলী সাহেবের বাড়ী নিমন্ত্রণ রাখিতে গিয়া ম্যাজিস্ট্রেট-গৃহিণী বার্বারার কত সুখ্যাতি করিয়া আসিয়াছেন, তিনি যে অমন একজন লোক পাইতেছেন না, সেজন্য কত দুঃখ করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু-- কি দুরদৃষ্ট—ম্যাজিস্ট্রেট-গৃহিণী আজই আর একজন ছেলের ঝি নিযুক্ত করিয়া ফেলিয়াছেন!

হাকিম সাহেব কাছারী হইতে ফিরিবামাত্র গৃহিণী আসিয়া বলিলেন, "আর শুনেছ? ভীর্গ্যাং-বাড়ীতে একেবারে প্রলয় হয়ে গেছে: মহামহিমান্বিত প্রবলপ্রতাপান্বিত বার্বারা ঠাকরুণের জবাব হয়েছে। তিনি এখানে এসেছিলেন চাকরির জন্যে। আদুরে ঝি-চাকর আমার দু' চক্ষের বিষ, অমন লোক আবার আমি রাখবো?—মাইনে দিয়ে? ঘরের কড়ি দিয়ে বিদায় করে দিতে হয় অমন লোককে।"

বার্বারা সেদিন অনেক বড়লোকের ফটক ডিঙাইল। সে তিন ভাঁজ-করা লম্বা কাগজ খুলিয়া কৌসুলী সাহেবের প্রশংসা-পত্র দেখাইল; সবাই তাহাকে চেনে, কিন্তু কেহই কিছু করিতে পারিল না। চাকরি খালি নাই।

সন্ধ্যা হইয়া গেল, নিরাশহৃদয়ে অবসন্নদেহে মর্মাহত বার্বারা নিঃশব্দে মনিব-বাড়ীর দরজায় আবার মাথা গলাইল।

তাহার এতদিনের প্রতিপত্তি, এতদিনের বিশ্বস্ততা, এতদিনের কর্মনৈপুণ্য,—সে কি একটা ফুৎকারেই হাওয়ার সঙ্গে মিশাইয়া গেল!

চাকরির চেষ্টায় ব্যর্থমনোরথ হইয়া বার্বারা যখন ফিরিয়া আসিল, তখন কেহ তাহাকে সে বিষয়ের কোনো কথাই জিজ্ঞাসা করিল না। বার্বারা তাহা লক্ষ্য করিল। বার্বারার রোষতুষ্টির উপর যাহাদের চাকরি থাকা-না-থাকা নির্ভর করিত, ভীর্গ্যাং-গৃহিণীর প্রসন্নতা অপ্রসন্নতা পর্যন্ত নির্ভর করিত, সেই সব চাকর-দাসীরা আজ নিজেদের মধ্যে গা টেপাটিপি করিতেছে, দাঁড়াইয়া মজা দেখিতেছে।

এই ঘটনার পর বার্বারা এ সম্বন্ধে কোনো কথা তুলিলেই ভীর্গ্যাং-গৃহিণী অন্য পাঁচ কথা তুলিয়া কথাটা চাপা দিতেন। এ সম্বন্ধে যে তাঁহার নিজের কোনো হাত নাই এমন কথা বলিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না।

বার্বারার চলিয়া যাইবার দিন যতই ঘনাইতে লাগিল, গৃহিণীর বকশিশ দিবার প্রবৃত্তিও ততই বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। বার্বারার মনে হইতে লাগিল, এই বকশিশের রাশি তাহাকে ইস্ক্রুপের মতো, জোরে ঘা না দিয়া, শুধু কায়দায় পেচ কষিয়া ক্রমশঃ দূরে সরাইয়া ফেলিতেছে।

ইতিমধ্যে কৌঁসুলী সাহেব নিকোলাকে একটা লোহার কারখানায় কাজ শিখিবার জন্য ভর্তি করিয়া দিয়াছেন।

গৃহিণীর কাছে বকশিশ পাওয়াটা যখন প্রায় গা-সহা হইয়া আসিয়াছে ঠিক এমনি সময়ে একদিন স্বয়ং কৌঁসুলী সাহেব তাঁহার একটা প্রকাণ্ড পুরানো পোর্টম্যাণ্টো বার্বারাকে ডাকিয়া দান করিয়া দিলেন। বার্বারা একেবারে বসিয়া পড়িল; তবে তাহাকে সত্যই ছাড়াইয়া দেওয়া হইল! লিজি লাড্‌-ভিগকে ছাড়িয়া তাহাকে যে সত্যই চলিয়া যাইতে হইবে, একথা সে স্বপ্নেও ভাবিতে পারে না,—উহাদের দেখিতে না পাইলে বার্বারা আর বাঁচিবে না।

স্বয়ং কৌঁসুলী সাহেবের কাছে নিজের বক্তব্য জানাইয়া বার্বারা কতকটা হাল্কা বোধ করিল।

কৌঁসুলী সাহেব ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "এ বাড়ীতে যে তুমি ভালই ছিলে, আর সে কথা যে তুমি নিজেই বেশ বুঝতে পেরেছ, এতে আমি খুশী হয়েছি।" বার্বারা কিন্তু এরূপ উত্তরের আশা করে নাই।

খাতাপত্র দেখিয়া কৌঁসুলী সাহেব বার্বারাকে এক শত সতের ডলার দিয়া হিসাব মিটাইয়া দিলেন এবং বলিলেন, "এই যে জমেছে এ তোমার সৌভাগ্য। নিকোলার জন্যে এ পর্যন্ত খরচটা তো কম হয় নি।"

বার্বারা মনে মনে ঠিক করিল, এবার অন্যত্র চাকরি লইবার পূর্বে কিছু দিন বিশ্রাম করিয়া লইবে। সে কিছু দিন গাঁয়ে গিয়া থাকিবে। চৌদ্দ বৎসর বেচারী কেবল পরের জন্য খাটিয়া মরিয়াছে।

বিদায়ের দিনটা এতদিন তাহার কাছে ভারি ভয়ানক হইয়াই ছিল; কিন্তু কাটিল সহজেই। ঠিক সেই দিনেই ম্যাজিস্ট্রেটের বাড়ী কৌঁসুলী সাহেবের নিমন্ত্রণ। গৃহিণী এবং ছেলেমেয়েদের সকলকেই যাইতে হইল; সুতরাং গাড়ীতে উঠিবার সময়ে, বার্বারার বিদায়গ্রহণ ব্যাপারটা সংক্ষেপেই সমাপ্ত হইয়া গেল।

গাড়ী চলিয়া গেল। লিজির লোমশ কোমল পোশাকের স্পর্শ হাতে জড়াইয়া বার্বারা দরজার কাছে অনেকক্ষণ একা দাঁড়াইয়া রহিল।

চার

বাড়ী ফিরিবার পূর্বে, যেন কতকটা সাহস সঞ্চয় করিবার জন্যই হল্‌ম্যান্‌-ছুতার প্রত্যহ যথাসময়ে সেল্‌ভিগের দোকানে গিয়া হাজির হইত। বোতল খুলিয়া নিয়মিত মাত্রা চড়াইলেই তাহার মুখখানা ভাবহীন নির্জীব মুখোশের মতো হইয়া উঠিত ; মনের অশান্তি এবং চোখের অস্থিরতা বিন্দুমাত্রও আর প্রকাশ পাইত না। গৃহিণীকে ঘরে আনিয়া অবধি বেচারা দিন দিন যেন জড়ভরত হইয়া পড়িতেছিল, কোনো বিষয়েই সে জোর করিয়া কিছু বলিতে পারিত না। ক্রমশঃ গৃহিণীর কথায় সে উঠিতে বসিতে লাগিল। এইরূপ হীনতার মধ্যে তাহার সকল গ্লানি ভুলিবার ঔষধ হইয়াছিল মদ।

তাড়াতাড়ি কয়েক পাত্র নিঃশেষিত করিয়াই হল্‌ম্যান্‌ দার্শনিকের মত গম্ভীর হইয়া পড়িত। তাহার দৃষ্টি নিশ্চল, মন চিন্তামগ্ন। সে কি যে ভাবিত তাহা কেহ জানে না। হল্‌ম্যানের অন্তরঙ্গেরা বলে, দাম্পত্য-জীবনের সুখ-দুঃখ-বিচারই উহার চিন্তার একমাত্র বিষয়। কাযকারণের এত বাঁধাবাঁধি সত্বেও, কোন্‌ কর্মফলে দস্তুরমতো সংসারী হইয়াও সে সারাটা সন্ধ্যা সেল্‌ভিগের দোকানে কাটাইয়া যায়, ইহাও একটা ভাবনার কথা বটে।

প্রতি সপ্তাহের শেষে শনিবার বৈকালে একটি লম্বা ছিপ্‌ছিপে মেয়ে, একখানা ফর্দ এবং একটা চুপড়ি লইয়া হল্‌ম্যানের দোকানে আসিত এবং হল্‌ম্যান্‌ বাড়ী না পৌছানো পর্যন্ত উহার সঙ্গ ছাড়িত না। মেয়েটি সিলা।

হল্‌ম্যান্‌ হপ্তার রোজগার পকেটস্থ করিয়া, দোকানের ঝাঁপ ফেলিয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িত। মেয়ের সঙ্গে কিছু দূর চলিয়াই তাহার গতি মন্থর হইয়া আসিত, শেষে সেল্‌ভিগের দোকানের কাছে আসিয়াই "দেখ, একটা জিনিস ফেলে এসেছি, দাঁড়াও, এখুনি আসছি" বলিয়া সিলাকে বাহিরে দাঁড় করাইয়া হল্‌ম্যান্‌ মাতালের দলে ভিড়িয়া যাইত।

"এখুনি" যে কতক্ষণ তাহার আন্দাজ সিলা প্রতি শনিবারেই পাইয়া থাকে : সুতরাং সেও বিলম্ব না করিয়া লোহার কারখানার দিকে চলিয়া যায় এবং এখুনির মেয়াদ ফুরাইবার আগেই যথাস্থানে আসিয়া হাজির হয়।

শরৎকালের অপরাহ্ণ। পুলের উপর দিয়া কলের মজুর এবং কারিগরেরা

দলে দলে বাসায় ফিরিতেছে—কাহারো সঙ্গে স্ত্রী, কাহারো সঙ্গে ছেলে, কাহারো সঙ্গে মেয়ে। আজ বেতন পাইবার দিন; এক সপ্তাহের রোজগার পাছে এক ঘণ্টায় উড়াইয়া দেয়, এই ভয়ে আপনার লোকেরা আজ তাহাদের চোখে চোখে রাখিয়াছে।

যে সব ফটকের ভিতর হইতে পিঁপড়ার সারির মতো লোক বাহির হইতেছে, সিলা তাহারি একটার মধ্যে প্রবেশ করিল। সেখানকার রাস্তার কাদা তেলচিটার মতো কালো, দুই পাশে লোহা-লক্কড়।

সিলা যেখানটাতে গিয়া দাড়াইল সেটা আনাগোনার পথ, পথের এক পাশে একটা প্রকাণ্ড রাবিশের স্তূপ। লোকের ভিড় আর কমে না, সিলাও পিছাইতে পিছাইতে ক্রমশঃ ঢিবির উপরে গিয়া দাঁড়াইল। ভিতরে এখনো অনেকে মাহিনার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। সিলা উঁচুতে দাঁড়াইয়া উদ্‌গ্রীব হইয়া দেখিতেছে।

হঠাৎ নীচে হইতে কে বলিয়া উঠিল, "কি গো ভালমানুষের মেয়ে, বঁধুর খোঁজে নাকি?"

ঠিক এই সময়ে নিকোলার সঙ্গে চোখোচোখি হওয়ায় সিলা আগ্রহে হাতের ফর্দ নাড়িয়া উহাকে ডাকিতে লাগিল, অসভ্য লোকটার কথায় কর্ণপাত করিল না।

নিকোলা বাহির হইয়া আসিল, সে এখনো হাত-মুখ ধোয় নাই, কারখানার কালিতে তাহার সর্বশরীর অপরিষ্কার।

"লোকটা সরে গেছে!"

"কে?"

"নাম তো জানিনে, চুলগুলো তামাটে, জামাটা নীল; বোধ হচ্ছে গ্রন্‌লীনে থাকে; আমায় বলে, বঁধুর খোঁজে এসেছ নাকি?"

"বঁধু দেখিয়ে দিই একবার হাতে পেলে, পিটিয়ে লম্বা করে দিই বাছাধনকে। ছিড়ে—পিঁজে ফেলি—পুরানো কাছির মতন—ওর ওই তামাটে চুলগুলো, আলকাতরায় ডুবিয়ে নিলে দিব্যি মশাল হবে।"

নিকোলা কট্‌মট্ করিয়া চারিদিকে চাহিল, কিন্তু লোকটার কোনো চিহ্ন দেখিতে পাওয়া গেল না।

হঠাৎ নিকোলার রাগ পড়িয়া গেল। সে সিলাকে বলিল, 'এখন? রুটির দোকানে?"

আজ তাহার হাতে সপ্তাহের রোজগার, সুতরাং রুটির দোকানে পৌঁছিতে বিলম্ব হইল না।

নিকোলা খুব খাইল, খুব খাওয়াইল। বিশেষ. 'জ্যাম্' দেওয়া একরকম দামী 'কেক' কিনিতে উহার অনেক পয়সা খরচ হইয়া গেল। সে যে পয়সায় এ সপ্তাহে দুইটা গেঞ্জি কিনিবে মনে করিয়াছিল, তাহা আজ দুইজনে খাইতেই ফুরাইয়া গেল।

নিকোলা নিজে যে কেমন লায়েক ছোকরা হইয়া উঠিয়াছে তাহাও সিলার কাছে গল্প করিল। সে এ সপ্তাহে ছয়টা জাহাজী গজাল তৈয়ার করিয়াছে। শুধু পিটাইলেই হয় না; পিটাইতে হয়, তাতাইতে হয়, ঠিকমতো সময়ে বাঁকাইতে হয়. তবে হয়। অন্য ছোকরারা কাস্তে, কোদাল আর গাড়ীর সাজ গড়িতে শিখিতেছে, নিকোলা তালা-চাবির কাজ, না হয়, ঢালাইয়ের কাজ শিখিবে।

সিলা কিন্তু এসব কথায় তেমন কান দেয় নাই; গত রবিবারে বড় কারিগরের সঙ্গে নিকোলা যে বনভোজনে গিয়াছিল, তাহারই বর্ণনা শুনিতে সে উদ্‌গ্রীব; বলিল, "সেদিন খুব মজা হয়েছিল! না?"

"হাঁ হয়েছিল বৈ কি! খুব আমোদ, খুব খাওয়া-দাওয়া। অ্যাণ্ডার্সবার্গ লোকটি খাসা; মাসখানেকের মধ্যেই দোকান করে ফেলবে, বিয়েও করবে।"

"আচ্ছা তোমাদের সঙ্গে সেদিন আর যে মেয়েরা ছিল তারা কেমন? সবারি কি বিয়ের ঠিক্‌ঠাক্ হয়েছে?"

"হুঁঃ!"

"অ্যাঁ?"

"আরে ছ্যাঃ!"

"কেন? কি হয়েছে? আমাকে বলবে না?"

"তাদের আবার বিয়ে! আজ এর সঙ্গে মিশছে, কাল ওর সঙ্গে বেড়াচ্ছে; কোনো ভদ্র কারিগরের সঙ্গে এক ঘরে ঘর করবার মতো তারা মোটেই নয়। আমি যখন কারিগর হব,—সিলা,—তোমার ফেরবার সময় হয়েছে—না? চল ফেরা যাক।"

"কই? কোথায় সময় হয়েছে? তুমি জ্যামের পুর দেওয়া আরেকখানা কেক্ কিনে নিয়ে এস, লক্ষ্মীটি,—এস নিয়ে!"

নিকোলা চট্ করিয়া আর একখানা 'কেক্' কিনিয়া আনিল। "যেতে যেতে খাওয়া যাবে, কি বল, সিলা? নইলে তোমারি দেরী হয়ে যাবে। আর তোমার মা যদি টের পান যে তুমি আমার সঙ্গে লুকিয়ে দেখা করতে এসেছিলে, তা হলে আর রক্ষে থাকবে না।"

"তাড়াতাড়ির কোনো দরকার নেই, সেল্‌ভিগের দোকান থেকে বাবার এখনো বেরুতে দেরী আছে"—বলিয়া সিলা অপ্রস্তুতভাবে ঢোক গিলিল। "মা যদি কিছু বলে তো বলব বাবার জন্যেই দেরী হয়েছে। তা' ছাড়া আজ শনিবার,—বলব—দোকানে যে ভিড় ফর্দ মিলিয়ে জিনিস কেনা দূরে থাক, দোকানের কাছে ঘেঁসে কার সাধ্যি? এদিকে এখন যে রকম খাওয়া হল, এতে আর রাত্তিরে খেতে পারা যাবে না। মাকে বলব, দোকানের ভিড়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাথা ধরে ভারি অসুখ করেছে, কিছু খেতে পারব না। যদি টের পায় তোমার কাছে এসেছিলুম, তা হ'লে যা চটবে!—তুমি অমন গম্ভীর হয়ে উঠলে কেন?"

"দেখ দেখি, হক্ না হক্ তোমাকে এই মিথ্যা কথাগুলো কইতে হয়, প্রত্যহ কইতে হয়,—এর নাম শাসন! ওঁর সম্মুখে ভয়ে কারু সত্যি কথা কইবার জো নেই! ওঁর কাছে সত্যি কথা বলে সেটা বজায় রাখতে হলে যথেষ্ট মনের জোর এবং সঙ্গে সঙ্গে গায়ের জোরেরও দরকার, নইলে আমার মতন মার খেয়ে মরতে হয় আর কি। আমার জন্য ভয় করিনে, সে তো চুকে বুকে গেছে। কিন্তু তুমিও যে ভয়ে সত্যি কথা বলতে সাহস পাও না, এ একেবারে অসহ্য! একটা বদ্ অভ্যাস জন্মে যাচ্ছে।"

সিলা হাসিয়া কথাটা হাল্কা করিয়া দিবে ভাবিয়াছিল, কিন্তু পারিল না। সে এ বিষয়ের আলোচনা ভালই বাসিত না, কারণ সে জানিত, নিকোলা যতই রাগ করুক, মিথ্যা না বলিলে সিলার জীবন দুর্বহ হইয়া উঠিবে। মার সঙ্গে একটি দিনও বনিবে না।

"দেরি হয়ে যাচ্ছে, নিকোলা। চল, ও কথা পরে হ'বে এখন।"

পকেটে হাত রাখিয়া হাত গরম করিতে গিয়া হঠাৎ সিলার মুখ ফ্যাকাশে হইয়া উঠিল। সে দুই হাতে দুইটা পকেট হাতড়াইল, এদিক ওদিক দেখিল, তাড়াতাড়ি বডিসের বোতাম খুলিয়া খুঁজিতে লাগিল।

"নিকোলা! আমার টাকা।" কাপড় ঝাড়া দিয়া পাগলের মতো এদিক ওদিক চাহিয়া সিলা আবার বলিয়া উঠিল, "আমার টাকা! দুখানা পাঁচ

টাকার নোট আরো কী খুচরো জড়িয়ে বাবা আমার হাতে দিলেন, আমিও তখুনি পকেটে রেখেছি। কি হবে, নিকোলা? আমি কি করবো?" সিলা কাঁদিয়া ফেলিল।

দু'জনে মিলিয়া কত খুঁজিল।

তাই তো! এতক্ষণ কাহারো খেয়াল হয় নাই! সিলা যখন রাবিশের স্তূপে দাঁড়াইয়া কাগজের ফর্দ নাড়িয়া নিকোলাকে ডাকিতেছিল, নিশ্চয় তখনই টাকাটা পড়িয়া গিয়াছে। ঐখানেই আছে, কোনো সন্দেহ নাই। কোনো ভয় নাই। তখন সবে চাঁদ উঠিয়াছে। ফিকা আলোয় আস্তিন গুটাইয়া নিকোলা অনেক্ষণ খুঁজিল, তন্নতন্ন করিয়া রাবিশ ঘাঁটিল। পুলের ধার পর্যন্ত খুঁজিয়া আসিল, তবুও টাকা পাওয়া গেল না।

এদিকে রাত বাড়িতেছে। বাড়ীতে হয় তো সিলার খোঁজ পড়িয়াছে। সিলা আবার কাঁদিতে লাগিল।

নিকোলা ইহার পূর্বে তাহাকে দুই-একবার চুপ করিতে বলিয়াছিল, এবার কিন্তু সে হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "সিলা, চল, জন্মের শোধ আর একবার একসঙ্গে জ্যামের পুর দেওয়া কেক্ খেয়ে দুজনে মিলে জলে ঝাঁপ দিই। আর তা হলে কোনো ভয় থাকবে না।"

প্রস্তাবটা তামাশাই হোক আর নাই হোক, সিলা ও কথায় কান দিল না। সে একখানা প্রকাণ্ড কাঠের কুঁদার উপর বসিয়া কাঁদিতে লাগিল।

সতেরো বছরের ছেলে নিকোলা সমস্ত সপ্তাহের কালিঝুল মাখিয়া বিমর্ষ-ভাবে আকাশ-পাতাল ভাবিতেছে। তাহার দৃষ্টি ছিল একটা কাঠের কুঁদার একটা ছিদ্রে। চাহিয়া চাহিয়া তাহার মনে হইতেছিল ছিদ্রটা অতবড় কাঠখানাকে অসার করিয়া ফোঁপরা করিয়া ফেলিয়াছে। সতেরো বছরের শিক্ষানবিশ ভাবনার কোনো কূলকিনারা পাইল না। সিলারও কোনো উপায় হইল না।

সিলা উঠিল। চুপড়িটি লইয়া নতমুখে গৃহাভিমুখে চলিল। যতদূর যাইতে সাহসে কুলাইল, ততদূর পর্যন্ত নিকোলাও সঙ্গে সঙ্গে গেল। সে সিলাকে অভয় দিতে চেষ্টা করিল, বলিল, "ভয় কি? সত্যি তো আর মেরে ফেলবে না।"

সিলা চুপটি করিয়া চলিয়া গেল।

সিলা চলিয়া গেলে নিকোলা পুলের উপর দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ উহার দিকে চাহিয়া রহিল। সিলা চলিয়াছে অবনতমুখে মন্থর গতিতে। একবারও থামিল না, একবারও ফিরিয়া দেখিল না।

অন্ধকারে নিকোলা চুপি চুপি হল্‌ম্যানের জানালার নীচে আসিয়া দাঁড়াইল। সিলা ফোঁপাইতেছে।

হল্‌ম্যান্-গৃহিণীর প্রশ্নের ধমকে সিলা স্বীকার করিয়া ফেলিয়াছে যে, সে নিকোলার সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিল। আর যায় কোথা? তবে তো টাকা হারাইবেই; আধ-পেটা খাইয়া যাহার দিন কাটে সেই হতভাগার সঙ্গে অত ঘনিষ্ঠতা করিতে গেলে টাকা হারাইবে না তো কি? পেটের মেয়ে যখন এত নিষেধ সত্ত্বেও কথা শোনে না, তখন তো এ সব ঘটিবেই। নহিলে এত কষ্টের পয়সা কি কাৎলীর গরম জলের মত ধোঁয়া হইয়া উড়িয়া যায়? ছোঁড়া ঐ তর্কেই ছিল, সুবিধা বুঝিয়া হাতাইয়াছে আর কি!

সিলা বারংবার বলিতে লাগিল যে, নিকোলা উহার টাকা দেখেই নাই, তা লইবে কি;—আর দেখিলেই বা কি? নিকোলা সিলার একটি পয়সাও ছুঁইবে না,—একথা সে জোর করিয়া বলিতে পারে। সিলার শেষ কথায় নিকোলার কপাল ভাঙ্গিল—হল্‌ম্যান্-গৃহিণী পুলিসে খবর দেওয়াই শ্রেয় মনে করিলেন।

পরদিন সকালে কামারশালায় পুলিস গিয়া হাজির। একটি অল্পবয়স্ক বালিকার নিকট হইতে টাকা ভুলাইয়া লওয়ার অপরাধে নিকোলাকে উহারা থানায় চালান করিয়া দিল।

উহারা চলিয়া গেলে বড় কারিগরদের মধ্যে তর্ক বাধিয়া গেল। অ্যাণ্ডার্সবার্গ নেহাইয়ের উপরে সজোরে হাতুড়ি হানিয়া বলিল, "নিকোলা চুরি করেছে, এ আমি বিশ্বাসই করিনে। ও নিশ্চয় খালাস পাবে।"

অন্য মিস্ত্রিরা জোর করিয়া কিছুই বলিল না; তবে একটা নামজাদা কারখানায় পুলিস বসানো—এ একেবারে অসহ্য। নিকোলা দোসরা জায়গায় গিয়া কাজ শিখুক। এ ব্যাপারের পর উহাকে এখানে আর ঢুকিতে দেওয়া নয়।

পুলিসের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ে মানুষের যাহা হইয়া থাকে, নিকোলারও হইল তাহাই; সে ভয়ে কেমন যেন জড়ভরত হইয়া গেল। সে নিজের নির্দোষিতার কথা মনে করিয়া বলসঞ্চয়ের চেষ্টা পাইল, কিন্তু সে বল টিকিল না। নিকোলার অন্তরে আত্মমর্যাদার ক্ষুদ্র অঙ্কুরটি ইতিপূর্বে হল্‌ম্যান্-গৃহিণী এতবার এবং এমনি করিয়াই পদদলিত করিয়াছেন যে, সেটি আর তেমন বাড়িতে পায় নাই; সুতরাং আজ যে উহা নিকোলাকে ছায়াদান করিবে তাহা দুরাশা মাত্র।

এইরূপ সাত-পাঁচ ভাবিতে ভাবিতে নিকোলা হঠাৎ পুলিসের হাত হইতে

পলাইয়া বাঁচিবার দুরাশায় একবার একটা ঝট্‌কা দিল। পালাইতে তো পারিলই না, লাভের মধ্যে আরো দুইজন পাহারাওয়ালা আসিয়া তাহাকে ঘিরিয়া লইয়া চলিল।

থানায় গিয়া সে কোনো প্রশ্নেরই ভাল করিয়া জবাব দিল না। সিলা? শনিবারে সে সিলা টিলা :কাহারও সঙ্গে বেড়াইতে যায় নাই। নিকোলা এ ব্যাপারের সঙ্গে সিলার নাম জড়াইতে চাহে নাই, কিন্তু শেষে যখন স্বয়ং সিলাকে তাহার সম্মুখে হাজির করা হইল এবং সিলা যে তাহাদের গুপ্ত সাক্ষাতের কথা প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছে তাহাও নিকোলা শুনিল, তখন সে অগত্যা সিলার সঙ্গে কেকের দোকানে যাওয়ার কথা পুলিসের কাছে একরার করিল।

সিলার সেই এক কথা, নিকোলা টাকা লয় নাই। এদিকে, নিকোলা যাহাদের সঙ্গে একত্র বাসা করিয়া থাকিত, তাহারা সকলেই এক বাক্যে বলিল যে শনিবারে সে রাত্রি করিয়াই ফিরিয়াছিল এবং রবিবারে ভোরে উঠিয়াই আবার কোথায় চলিয়া গিয়াছিল।

নিকোলা বলিল, "ওই হারানো টাকারই খোঁজে আমি বার হয়েছিলাম।" কিন্তু আসামীর কথা পুলিসের লোকে বিশ্বাসযোগ্য মনে করিল না।

"এই বয়সেই ছোঁড়া একেবারে এ কাজে পেকে উঠেছে"—নিকোলার 'দুধ-মা' হল্‌ম্যান্‌-গৃহিণী এই মন্তব্য প্রকাশ করিলেন।

নিকোলা নিশ্চল, মুখ অবনত, মাঝে মাঝে ভ্রূ কুঞ্চিত করিতেছে। দারোগা-সাহেব পাকা হুনরীর মতো উহাকে খুব বিচক্ষণার সঙ্গেই লক্ষ্য করিতেছিলেন। নিকোলার কপালের ডাইন দিকে চুলের 'মোড়', উহার তীক্ষ্ণ চোখ, চকিত দৃষ্টি, চওড়া চোয়াল কিছুই এড়াইয়া যায় নাই। দারোগাসাহেব মনে মনে বলিলেন, "ছোক্‌রা পুলিসকে অনেকবার ভোগাবে দেখছি।" রেকর্ডে লেখাইলেন, "অন্যান্য দুষ্ট লোকের সঙ্গে পরামর্শ করিবার সম্ভাবনা থাকা বিধায় এবং পুলিসের হাত ছিনাইয়া পলাইবার চেষ্টা করা বিধায় বিচারের পূর্ব পর্যন্ত আসামীকে হাজত বাসের হুকুম দেওয়া হইল।"

নিকোলার ঘর্মাক্ত ললাটে আবার কুঞ্চন-প্রসারণ চলিতে লাগিল। হায়, গরীবের আর নিস্তার নাই, একবার পদস্খলন হইয়াছে কি না হইয়াছে অমনি বেচারা ধরা পড়িয়াছে; কাহার কোথায় একটা টাকা হারাইল, অমনি গরীব গেল হাজতে।

তার পরদিন হাকিমের এজলাসে প্রমাণাভাবে নিকোলা অগত্যা খালাস পাইল।

হাজতের বাহিরে আসিয়া তাহার কেবলি মনে হইতে লাগিল, যেন রাস্তার সকল লোকের দৃষ্টি আজ তাহারই দিকে। নিকোলার পা টলিতে লাগিল।

বাসায় ফিরিয়া দেখিল, তাহার সমস্ত জিনিসপত্র দেউড়িতে পড়িয়া আছে। বাসার ঝি আসিয়া কোনো কথা না বলিয়া তাহার হাতে একখানি কাগজ দিল; নিকোলা পড়িল, "তোমার ঘরে অন্য ভাড়াটিয়া আসিয়াছে। জিনিসপত্র উঠাইয়া লইয়া চলিয়া যাও।"

কেন যে তাহাকে উঠাইয়া দেওয়া হইতেছে, সে বিষয়ে নিকোলা কোনো প্রশ্নই করিল না। তাহার সঙ্গে যে কেহ কথা কহিল না ইহাতেই সে অত্যন্ত ব্যথা পাইয়াছিল।

এদিকে আবার কারখানায় যাইতে হইবে; সর্দারের কাছে, মিস্ত্রিদের কাছে আবার মুখ দেখাইতে হইবে,—নিকোলা লজ্জায়, সঙ্কোচে মরিয়া যাইতেছিল। না জানি অ্যাণ্ডার্স্‌বার্গ কি মনে করিতেছে।

নিকোলা ফিরিয়াছিল আর কি, কিন্তু ফিরিলে চলে কই। নিকোলা আবার বুক বাঁধিল, সোজা হইয়া শিস্‌ দিতে দিতে কারখানার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। হঠাৎ মোড় ফিরিয়া কারখানার ভুসো-মাখা রেলিঙে নজর পড়িতেই নিকোলার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম বাহির হইয়া পড়িল।

কামারশালায় ঢুকিয়াই সে কোনো দিকে না চাহিয়া ঝোড়ায় করিয়া কয়লা তুলিতে লাগিল। এখানেও কেহ তাহার সঙ্গে কথা কহিল না।

অ্যাণ্ডার্স্‌বার্গ ঠিক সময়ে আর একজন মিস্ত্রির সঙ্গে মিলিয়া একখানা প্রকাণ্ড তপ্ত লোহা পিটাইতেছিল। সে হাতের কাজ সারিয়া খানিক পরে নিকোলার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং পিঠ চাপড়াইয়া বলিল, "আমি জানতুম ঠিক খালাস পেয়ে যাবে; এই নাও, এই চাবি তিনটেতে উখো লাগাও দেখি।"

নিকোলা কাজ পাইয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। অ্যাণ্ডার্স্‌বার্গের হৃদ্যতায় সে আবার আগেকার মানুষ হইয়া উঠিয়াছে; ঠিক তেমনি আদর তেমনি খাতির!

নিকোলা কাজে লাগিয়া গেল। কামারের কাজে যে এত গৌরব, এত আনন্দ তাহা নিকোলা পূর্বে জানিত না। সে মোটা উখা রাখিয়া দিয়া

একেবারে সরু উখা লইয়াই কাজ শুরু করিয়া দিল এবং অল্প সময়ের মধ্যেই কেঠো ফটকের নিরেট চাবিটা দেরাজের দামী চাবির মতো উজ্জ্বল করিয়া তুলিল। নিকোলার উখার শব্দ হাতুড়ির শব্দকেও আজ ছাপাইয়া উঠিয়াছে।

নিকোলার ঠিক পাশেই একজন মিস্ত্রি মাথাওয়ালা পেরেক তৈয়ার করিতেছিল, উহার হাপরে ছিল একজন ছোকরা। উহারা দুইজনে মিলিয়া আজ খুব হাসিগল্প চালাইয়াছে। প্রথমে নিকোলা সে দিকে কান দেয় নাই, নিজের কাজেই ব্যস্ত ছিল; হঠাৎ মাথা তুলিয়া নিকোলা দেখিল ছোকরাটা নিকোলাকে লক্ষ্য করিয়া মুখভঙ্গী করিতেছে, নিকোলার চোখ-কান অমনি সজাগ হইয়া উঠিল। সে বুঝিল যে সে নিজেই উহাদের আলোচনার বিষয়।

জান্ পিটার এক একবার হাপরের কাছে আসিয়া, এ কি বলিতেছে এবং ও কি ঠাওরাইতেছে তাহার খবর দিয়া যাইতেছে। এখন নিকোলা মোটামুটি সবই শুনিতেছে।

চিড়িয়াখানার পশু যেমন সকলের কৌতুকের বিষয়, নিকোলা আজ তেম্নি —না, তাহারও অধম সে গাঁটকাটা,—অন্ততঃ তাহার সঙ্গীরা ইহাই ঠাওরাইয়াছে। এখন হইতে উহারা কেহই যে আর নিকোলাকে এক বাসায় জায়গা দিবে না, এ কথা নিকোলা স্পষ্ট বুঝিল। নিকোলার মনে হইতে লাগিল, উহারা যেন সকলে মিলিয়া নিকোলার হৃৎপিণ্ডটা হাতুড়ি দিয়া পিটাইতেছে, উখা দিয়া ঘসিতেছে। উহাদের হাসিতে বিদ্রূপ, চাহনিতে অবজ্ঞা। নিকোলা সব বুঝিয়াছে।

যে লোকটা পেরেক গড়িতেছিল সে হঠাৎ হাপরের ছোক্‌রাটাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠিল, "জানিস্ রে, ম্যাথিয়াস্! কামারের কাজ কষ্টের কাজ; এর চেয়ে একটা খুব সোজা কাজ আছে, রোজগারও খুব—তারে বলে পাঁচ আঙুলের প্যাঁচ; সেইটে শিখে নে, বুঝেছিস্?"

"হিঃ হিঃ হিঃ" ছোকরটা হাসিয়া উঠিল।

"আর তা যদি না পারিস্ তো ঘাগরার পকেট মারার মতো চিম্‌টে গড়াতে শেখ; শহরের যত মেয়ের পকেট মারবি, কেমন?"

লোকটার সঙ্গে নিকোলার চোখোচোখি হইল। লোকটা বিদ্রূপের হাসি হাসিতেছে দেখিয়া নিকোলা রাগে আগুন হইয়া উঠিল। তাহার মাথা গোলমাল হইয়া গেল, নিকোলা ঝাপসা দেখিতে লাগিল।

লোকটা পেরেক লইয়া মাঝে মাঝে নিকোলার পাশ দিয়াই আনাগোনা

করিতেছিল। এবার যেমনি যাইবে অমনি নিকোলা দাঁড়াইয়া উঠিয়া প্রকাণ্ড একটা উখার ঘায়ে তাহাকে শোয়াইয়া দিল। পেরেকগুলা ছড়াইয়া পড়িল।

বিস্মিত কারিগরেরা মুহূর্তের মধ্যে তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিল।

ইতিমধ্যে নিকোলা একটা প্রকাণ্ড হাতুড়ি তুলিয়া লইয়াছে। সে একধার হইতে সকলকে শোয়াইয়া দিবে, তাহার নামে যাহারা মিথ্যা বদ্‌নাম দিতে সাহস করে, তাহাদের সকলকে সে একবার দেখিয়া লইবে।

কিন্তু কামারের দল তাহাকে প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিবার মোটেই অবসর দিল না। একজন পিছন হইতে উহার হাতুড়িটা কাড়িয়া লইল, তারপর চলিল প্রহার। প্রহারের চোটে নিকোলা সর্ষে ফুল দেখিতে লাগিল। মার, মার, মার, দল বাঁধিয়া মার, হাত বাড়াইয়া মার, হুম্‌ড়ি খাইয়া মার। এত বড় আস্পর্ধা হাতিয়ার তোলে, এখনই উহাকে তাড়াইয়া দেওয়া হোক।

কোটের কাপড়ের সঙ্গে গায়ের মাংস সুদ্ধ মোচড়াইয়া ধরিয়া নিকোলাকে কারখানার বাহিরে ফেলিয়া দেওয়া হইল। ফেলিয়া দিল অ্যাণ্ডার্স্‌বার্গ, নহিলে বেচারা মারের ধমকে সেইখানেই মরিয়া যাইত।

কারখানার সঙ্গে নিকোলার সম্বন্ধ ফুরাইল।

সেদিন আর নিকোলা বাসা খুঁজিল না। তাহার চেহারা এবং পোশাকের দুর্দশা দেখিলে, তাহাকে এ অবস্থায় জায়গাও কেহ দিত কি না সন্দেহ। তাহার উপর, কারখানায় সে যে কাণ্ড করিয়া আসিয়াছে, ইহার পর কাহারো কাছে মুখ দেখাইতে তাহার সঙ্কোচ হইতেছিল। সন্ধ্যার অন্ধকারে নিকোলা নিঃশব্দে বান্‌-হাউসের চত্বরে ঢুকিয়া পূর্বের মতো তেরপল মুড়ি দিয়া জীবনের আরেকটা রাত্রি যাপন করিবার ব্যবস্থা করিয়া লইল।

সে রাত্রে কিন্তু পূর্বের মতো সহজে ঘুম আসিল না। আকাশ ভরিয়া তারা উঠিয়াছে; আর প্রহৃত, অবমানিত, নিরাশ্রয়, নির্দোষ নিকোলা তেরপলে শুইয়া মনে মনে আওড়াইতেছে—

"এই ভূমণ্ডল দেখ কি সুখের স্থান,
সকল প্রকারে সুখ করিতেছে দান!"

পাঁচ

নিকোলা এখন একেবারে বেকার।

সে কাজের জন্য কোনো লোহার কারখানাতেই উমেদারী করিতে গেল না; কারণ, নিকোলা জানিত একটা কারখানা হইতে যাহার অন্ন উঠিয়াছে, অন্য কোনো কারখানাতেই তার আর আশা-ভরসা নাই। কারিগরে কারিগরে আলাপ, সুতরাং খবর রটিতে বিলম্ব হয় না। এদিকে, সে যে-ছুতারের ঘরে রাত্রে মাথা গুঁজিবার বন্দোবস্ত করিয়াছে, সেও আজ কয়দিন হইতে নিকোলার কারখানা ত্যাগের বিবরণ শুনিবার জন্য হঠাৎ অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে, যেন উহা না শুনিলে আর লোকটার ঘুম হইবে না। পরের কথায় অত মাথাব্যথা কেন বাপু?

নিকোলা জবাবদিহির হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য সরিয়া পড়িল।

ডকে - এত জাহাজ, এত বোঝাই খালাসের কাজ,—এ জায়গায় দশজনের উপর আর একজন বাড়িলে বেশ চলিয়া যাইবে, অথচ কাহারো বিশেষ ক্ষতি করাও হইবে না। আধপেটা খাইয়া, উপবাস করিয়া আর চলে না; নিকোলা শেষে সাহসে বুক বাঁধিয়া কাজের আশায় ঐ ডকেই গিয়া হাজির হইল।

সে স্পষ্ট বুঝিতে পারিল যে, তাহার আগমনে মুটিয়ামহলে বেশ একটু সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। খুব চালাক ছোক্রা! চালাকির জোরে পুলিসের হাতে পড়িয়াও কেমন উদ্ধার পাইয়া আসিয়াছে! মুটিয়ারা সব জানে! এই শ্রেণীর লোকের চক্ষে পুলিসের হাত ফস্‌কাইয়া পলাইয়া আসাটাই সকলের চেয়ে বাহাদুরীর কাজ। সুতরাং ইহাদের সমাজে নিকোলা একজন বাহাদুর বলিয়া সহজেই পরিচিত হইয়া উঠিল।

নিকোলাকে নিষ্কর্মা ফুর্তিবাজ ভাবিয়া প্রথম প্রথম মুটিয়ারা বেশ একটু খাতির করিত। শেষে যখন দেখিল যে জাহাজ আসিতেই ছোঁড়াটা উহাদেরি মতো যাত্রীদের ট্রাঙ্ক ঘাড়ে করিয়া ছুটাছুটি আরম্ভ করিয়াছে, তখন উহারা ভারি চটিয়া গেল। নিকোলার কি জেটিতে ঢুকিবার চাপরাশ আছে? না, ছোকরা ভাবিয়াছে—পরের রুটিতে ভাগ বসান ভারি সহজ? ও যে কি রকমের লোক তাহা আর উহাদের জানিতে বাকী নাই।

নিকোলা মনে মনে জানিত যে, যখন কারখানা হইতে তাহার নাম

কাটিয়া দিয়াছে, তখন জেটিতে ঢুকিবার চাপ্‌রাশ চাহিতে যাওয়া তাহার পক্ষে বিড়ম্বনা ; সুতরাং পেটের জ্বালা নিবারণ করিবার জন্য, তাহাকে চোখ রাঙাইয়া এবং দরকার হইলে অন্য মুটিয়াদের সঙ্গে ঘুষোঘুষি করিয়াও মোট মাথায় তুলিতে হইবে ; পয়সা রোজগার করিতে তো হইবেই। অন্য মুটিয়ারা গালিই দিক আর যাহাই বলুক, নিকোলা যে মোট প্রথম ছুঁইয়াছে, সে মোট সে আর কাহাকেও ছুঁইতে দিবে না ; সে কোনো কথায়, কোনো টিট্‌কারীতে কান দিবে না, এ অবস্থায় নিকোলা বদ্ধকালা।

এদিকে, যেখানে একটা মোট, সেখানে দশটা মুটিয়া, সুতরাং এততেও নিকোলার পেট ভরিত না। কাজেই, সে লোকের বাড়ীতে ভাঙা কুলুপ সারিয়া দরজা-জানলার কব্জা বদলাইয়া মাঝে মাঝে দুই-চারি আনা উপরি রোজগার করিতে বাধ্য হইত। ইহাতেও কিন্তু কুলাইত না। বিশেষতঃ শীতকালে, আগুন পোহাইবার কাঠ কিনিতে গেলে পেট ভরিত না, আবার পুরা পেট খাইতে গেলে শীতে কষ্ট পাইতে হইত। নিকোলা এক বেলা খাইতে আরম্ভ করিল ; রাত্রে সে খালিপেটে শুধু একটু মদ খাইয়া থাকিত। কি সুবিধা ! মদ খাইয়া শরীরটা বেশ গরম হইয়া ওঠে, সুতরাং আগুন পোহাইবার কাঠের খরচটা আর লাগে না ; আবার পেটেও কিছু পড়ে, সুতরাং ক্ষুধাটাও তত প্রখর থাকে না। ভারি মজা !

এদিকে কিন্তু ভাবনার অন্ত নাই, সকালে উঠিয়াই আবার কাজের খোঁজে বাহির হইতে হইবে। হয় জেটিতে মোট বহা, না হয় এই শীতে বরফ কাটিয়া কাটিয়া লোকের দরজা খোলসা করিয়া দেওয়া। না আছে একটা ওভার-কোট্‌, না আছে একটা আস্ত জামা। সম্বলের মধ্যে শুধু সেই কারখানার দরুন পোশাকটা।

আজকাল পথে ঘাটে পুরানো কারখানার কোনো মিস্ত্রির সঙ্গে দেখা হইলে নিকোলা অবজ্ঞার ভঙ্গীতে হাসিয়া উঠে,—সে যে এখন উহাদের মতো কারো তাঁবেদার নয়, সে যে এখন স্বাধীন, এইটাই যেন সে জোর করিয়া সকলকে জানাইতে চায়।

নিকোলা একদিকে যেমন কারখানার পথ মাড়ানো বন্ধ করিয়াছিল, অন্য দিকে তেমনি হল্‌ম্যান্‌দের বাড়ীর রাস্তা দিয়াও হাঁটিত না। কারণ যাহাই হোক, সিলার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে তাহার আর মোটেই ইচ্ছা ছিল না।

কারখানা হইতে মারপিট করিয়া যেদিন সে চলিয়া আসে, সেই দিন

সিলার সঙ্গে তাহার শেষ আলাপ। সেদিনকার কথা নিকোলা ভুলে নাই। সেদিন সিলা যতক্ষণ এক সঙ্গে ছিল, ততক্ষণ যেন কেমন সন্ত্রস্ত, কেমন যেন আড়ষ্ট,—নিকোলা তাহা লক্ষ্য করিয়াছিল। নিকোলা কাছে ঘেঁসিয়া আসিলেই সে তফাতে সরিয়া যায়, এদিক ওদিক চায়। বাড়ীর লোকের ভয়? না, তাহা তো নয়। হঠাৎ নিকোলার মাথা খুলিয়া গেল, সে বুঝিল, আজ সিলা তাহার সঙ্গে একত্র দাঁড়াইয়া কথা কহিতে লজ্জা বোধ করিতেছে—বিশেষতঃ পথে, লোকের সম্মুখে। বুঝিতে পারিয়াই নিকোলা তাড়াতাড়ি 'গুডবাই' বলিয়া সিলার কাছ হইতে যেন ছুটিয়া চলিয়া আসিয়াছিল।

তারপর সে সিলাকে যতবার দেখিয়াছে, ততবারই মনে হইয়াছে যেন সে বিষণ্ণ। নিকোলা বুঝিত, তাহার সঙ্গে মিশিতে সিলা উৎসুক,—ইহাতে নিকোলা মনে মনে খুব খুশী হইত; কিন্তু সিলাকে কাছে ঘেঁসিতে দিত না। কেক্ খাওয়াইবার পয়সা যাহার নাই, তাহার সঙ্গে আর ঘনিষ্ঠতা কেন?

যাহাদের কোর্তা তেমন পুরু নয় এবং সংখ্যাতেও খুব বেশি নয়, তাহাদের একজন চমৎকার বন্ধু আছে, তার নাম সূর্য। সে রোজ এমন হাজার হাজার শীতবস্ত্র বিতরণ করে,—তাহাকে বলে রৌদ্রের ওভার-কোট। সেই বন্ধুর দেখা পাইলে অসাড় হাত পায়েও সাড় ফিরিয়া আসে, খোরাকী রোজগারের আর ভাবনা থাকে না। পুরা সকালটা জেটিতে খাটিয়া নিকোলা রৌদ্রে দাঁড়াইয়া হাই তুলিতেছিল। হঠাৎ সে দেখিল, রৌদ্র নিবারণের জন্য মাথায় রুমাল বাঁধিয়া একটি ছিপছিপে মেয়ে দ্রুতগতিতে তাহারই দিকে আসিতেছে—এ আর কেউ নয়—এ সিলা।

সিলা তুঁতপোকার মতো বক্রগতিতে জাহাজ-ঘাটায় সদ্য আনীত মাছের ঝোড়াগুলার ভিতর দিয়া যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইতেছে। সোৎসুক দৃষ্টিতে সে একবার এদিকে চায়, একবার ওদিকে চায়। এইবার সে নিকোলাকে দেখিতে পাইয়াছে।

"নিকোলা! নিকোলা!" তাড়াতাড়িতে তাহার কথাগুলা মুখের মধ্যে জড়াইয়া যাইতেছে। "ভারি সুখবর! ভারি সুখবর! আমার সেই নীল জামাটাকে মেরামত করতে গিয়ে, তার অস্তরের ভিতর থেকে মা সেই হারানো টাকাগুলো পেয়ে গেছে, নোট টাকা সব ছিল—ওই অস্তরের পাশে পড়ে! আমি বাবাকে দোকানে খাবার দিতে এসেছিলুম, অমনি তোমাকেও তাড়াতাড়ি খবরটা দিয়ে যাচ্ছি। যাচ্ছি কারখানায়—তাদেরো সব বলতে

হবে, মিছেমিছি তোমার অপমান করেছিল। এ কি কেউ স্বপ্নেও জানত? ঠিক অস্তরের আর জামার কাপড়ের মাঝখানটিতে! আমি যে—আমি যে—কী খুশী হয়েছি তা বলে জানাতে পারি নে। মাকে যদি দেখতে—একেবারে মুখ গম্ভীর!"

নিকোলার মন গলিল না, সে অন্য দিকে চাহিয়াই বলিল, "আমার এতে ক্ষতিবৃদ্ধি নেই. তুমি তোমার মা-বাপকে এই কথা বলগে।"

কথাটা সিলার কানে পৌঁছিবার আগেই সে কারখানার দিকে ছুটিয়াছে।

অবশ্য নিকোলারও তাহাতে আপত্তি ছিল না। দিক খবর কারখানায়, সে যে নির্দোষ সে কথা সকলে জানুক। তবে, অ্যাণ্ডার্স্‌বার্গ এখন শহরের বাহিরে গিয়া দোকান করিয়াছে, সে আর কারখানায় নাই। নিকোলা অন্য মিস্ত্রিদের মতামতের বড় একটা তোয়াক্কা রাখে না। সে এখন স্বাধীন।

নিকোলা প্যাণ্টের পকেটে হাত পুরিয়া সাগরের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়াছিল। কয়জন কুলির ছেলে সাঁতার দিয়া একখানা পাঁউরুটি ধরিবার চেষ্টা করিতেছে। পাঁউরুটিখানা নোনাজল খাইয়া ভারী হইয়া পড়িয়াছে—প্রায় ডুবু-ডুবু।

হায়! সিলা যতই চেষ্টা করুক, নিকোলার সুনাম আর ফিরিবে না। একবার যাহাকে চোর বলা হইয়াছে, ঐ পাঁউরুটিখানার মতো নোনাজল ঢুকিয়া তাহাকে অব্যবহার্য করিয়া ফেলিয়াছে। যাক,—সে তো আর কারখানায় কাজের উমেদারীতে যাইতেছে না; সে এখন স্বাধীন, কারো তোয়াক্কা রাখে না। "এই ছোঁড়ারা! ধরতে পারলিনে পাঁউরুটি? তবে ভাখ কি করে ধরতে হয়; খেতে হবে কিন্তু তোদের.—বলে রাখছি।" বলিতে বলিতে নিকোলা জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

* *

হল্‌ম্যান্‌-ছুতার সেল্‌ভিগের দোকানের পুরানো খরিদ্দার। সকলে তাহাকে চিনিত এবং সে যে টাকার মানুষ এমন ধারণাও অনেকের ছিল। সুতরাং সে ধারেও মদ পাইত; হিসাব চলিয়াই আসিতেছিল। হল্‌ম্যান্‌-গৃহিণী এখবর মোটেই জানিত না। তাহার বিশ্বাস ছিল যে, হল্‌ম্যান্‌ যখন পকেট খরচ বলিয়া প্রতি সপ্তাহেই কিছু পয়সা নিজের কাছে রাখিয়া থাকে, তখন মদ ভাঙ যাহা খায় ঐ পয়সাতেই খায়।

এক শনিবারে, অভ্যাসমতো হল্‌ম্যান দোকানে ঢুকিয়াছে. সিলা বাজারের

চুপড়ি লইয়া বাহিরে অপেক্ষা করিতেছে। আজ সিলা বেশ একটু ফিটফাট। হঠাৎ তাহার মনে হইল, রাস্তার মোড়ে নিকোলার মতো কাহাকে যেন সে দেখিল, গত শনিবারেও তাহার ঐ রকম মনে হইয়াছিল।

কয় মাসের মধ্যে নিকোলার সঙ্গে ভাল করিয়া কথা কহিবারও সুযোগ সে পায় নাই।

সিলা দ্রুতপদে মোড়ের দিকে চলিল ;—নিকোলাই তো, নিশ্চয় নিকোলা। কিন্তু মোড়ের কাছে গিয়া আর সিলা তাহাকে দেখিতে পাইল না। কাজেই সেল্‌ভিগের দোকানের সবুজ দরজার দিকে সতর্কদৃষ্টি রাখিয়া বিষণ্ণমনে সিলা যথাস্থানে ফিরিয়া আসিল।

সিলা জানিত সাতটা বাজিলে আর হল্‌ম্যান্ সেখানে একদণ্ডও দাঁড়াইবে না। সুতরাং সে দরজার কাছে গিয়া আবার হটিয়া আসিল। আচ্ছা, সাতটা কি এখনো বাজে নাই? রাস্তার দুইধারে অনেক দোকানই তো বন্ধ হইয়া গেল। সিলা ছটফট করিতে লাগিল। আজ আর কিছুই কেনা হইবে না, দেখিতেছি। সব দোকান প্রায় বন্ধ হইল।

তাহার বাপ চলিয়া যায় নাই তো? সিলা যখন মোড়ের দিকে গিয়াছিল সেই সময়ে হল্‌ম্যান্ বাহির হয় নাই তো? সে তো কোনো দিন এমন দেরী করে না।

হঠাৎ দোকানের সবুজ দরজা খুলিয়া একজন পরিচারিকা খালি মাথায় তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল। এক মিনিটের মধ্যে আরো একজন লোক ঐ রকম তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল ; লোকটা ছুটিয়া গেল বলিলেই হয়। দেখিতে দেখিতে অংসখ্য লোক দোকান ঘরের ভিতর হইতে একেবারে সিঁড়ি কয়টার উপর আসিয়া ভিড় করিয়া দাঁড়াইল।

কি একটা কাণ্ড ঘটিয়াছে।

পর মুহূর্তে ঝন্‌ঝন্ করিয়া দোকানের একটা সাসি কে ভাঙিয়া ফেলিল। ব্যাপার কি?…কোনো মাতাল হাঙ্গামা আরম্ভ করিয়াছে, আর কি?…আজ শনিবার কিনা…মাত্রা ঠিক রাখিতে পারে নাই,…এখন বোধ হয় উহাকে পুলিসের হাতে দিতে হইবে।

সিলা এমন কাণ্ড অনেকবার দেখিয়াছে, সুতরাং ভয় পাইল না। হল্‌ম্যান্ সম্বন্ধে তাহার কোনো আশঙ্কা ছিল না, কারণ সে বেচারা কখনো কোনো হাঙ্গামায় ভিড়িত না।

কিন্তু···সবাই দোকান হইতে বাহির হইয়া পড়িল···হল্‌ম্যান্ কই?

সিলা ভাঙা সার্সির ভিতর দিয়া উঁকি দিয়া দেখিল—কয়টা মরকুটে জেরেনিয়মের গাছ, কিন্তু বিশেষ কিছু লক্ষ্য করিবার পুর্বেই মদের দোকানের উৎকট গন্ধে সিলাকে অবিলম্বে মুখ ফিরাইতে হইল।

সিলার কৌতূহল উদ্দীপ্ত হইয়াছিল, সুতরাং সে দুর্গন্ধ অগ্রাহ্য করিয়া পুনর্বার উঁকি মারিল।

ও কে?...ওই যে বুকের বোতাম খোলা···টেবিলের উপর সটান... একখানা হাত ঝুলিয়া পড়িয়াছে?···ও কি সিলার বাপ?···হল্‌ম্যান্?

"লোকটা যেন নড়ছে বলে বোধ হ'ল···নিকটে কারো কাছে একটা ল্যান্‌সেট পাওয়া যায় না—একটা ল্যান্‌সেট কোথাও নেই?"

ইহার পর যে কি হইল তাহা সিলা জানে না; শুধু এইটুকু মনে আছে যে, কে যেন তাহাকে ঘরের ভিতর ঢুকিতে বারণ করিতেছিল এবং কে যেন বলিল, "যেতে দাও,—ও হল্‌ম্যানের মেয়ে।"

জ্ঞান হইয়া সিলা দেখিল তাহার বাপের মাথা তাহার কোলের কাছে। তাহার মনে হইতেছে যেন সে খুব উঁচু হইতে পড়িয়া অজ্ঞান হইয়া গিয়াছিল।

আগে হল্‌ম্যানের গলা হইতে একটা ঘড়ঘড় শব্দ শোনা যাইতেছিল, এখন তাহাও বন্ধ হইয়া গিয়াছে। তাহার বিস্ফারিত চক্ষের দৃষ্টি কড়িকাঠের দিকে।

দরজার কাছে একখানা বেঞ্চির উপর একটা গুণ্ডা রকমের লোক বসিয়া আছে। সিলা উহাকে চেনে। মাতালদের মধ্যে কেহ হাঙ্গামা করিলে ওই লোকটাই দমন করে—ঘাড় ধরিয়া বাহির করিয়া দেয়।

ঘর নিস্তব্ধ; কেবল একটা মদের পিপার ছিপি-দেওয়া নলের মুখ হইতে একটা টিনের মগে টুপ টাপ করিয়া মদ টোপাইতেছে।

এই সময়ে একজন চশমা-পরা ছোকরা ঘরে ঢুকিল; বোধ হয় ডাক্তার! সে যন্ত্রের ব্যাগ খুলিতে খুলিতে বাঁধা গতের মতো উপর্যুপরি অনেকগুলা প্রশ্ন করিয়া, হল্‌ম্যানের বুকে একটা স্টেথোস্কোপ লাগাইল। পরক্ষণেই মাথা নাড়িয়া ল্যান্‌সেট বাহির করিয়া সিলার দিকে চাহিয়া বলিল, "ক্যামিজের কফটা গুটিয়ে ধর; দেখো; যেন নেমে না পড়ে।"

ডাক্তার যতক্ষণ অস্ত্র ফুটাইতেছিল সিলা ততক্ষণই এমনি করুণ ভাবে

তাহার মুখের দিকে চাহিয়াছিল যে, দেখিলে মনে হয়, যেন ঐ ডাক্তারেরই কাছে সে নিজের বাপের জীবন ভিক্ষা করিতেছে।

ল্যান্‌সেটে যাহা উঠিল তাহা রক্ত বলিয়া চেনা এক রকম অসাধ্য—ঘন, কাল্‌চে, চিটা গুড়ের মতো।

ডাক্তার আবার নাড়ী দেখিল, বুক পরীক্ষা করিল, আবার ল্যান্‌সেট লাগাইল! শেষে নীচের ঠোঁট দিয়া উপরের ঠোঁটটা ঠেলিয়া তুলিয়া মেডিকেল কলেজের বড় ডাক্তারদের মতো গম্ভীর চালে বলিয়া উঠিল, "হয়ে গেছে, অতিরিক্ত মদ খেয়ে মারা গেছে।"

সিলা চীৎকার করিয়া হল্‌ম্যানের বুকে লুটাইয়া পড়িল। ছোকরা ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিল, "এ কে? ওর মেয়ে নাকি?"

ডাক্তার যাইবার পূর্বে আলোর কাছে গিয়া সযত্নে অস্ত্রশস্ত্র মুছিয়া গুছাইয়া লইতে লাগিল এবং চশমার পাশ দিয়া বারংবার সিলার দিকে কটাক্ষপাত করিতে লাগিল।

সিলা বুক ভাঙা কান্না কাঁদিতেছিল, তাহার অন্য দিকে তখন দৃষ্টি ছিল না।

ডাক্তার যথাসম্ভব বিলম্ব করিয়া বিদায় হইল।

একজন বছর কুড়ি বয়সের ছোকরা এক হাতে চোখ মুছিতে মুছিতে আর এক হাতে আস্তে আস্তে সিলাকে হল্‌ম্যানের মৃত শরীর হইতে তফাৎ করিতে চেষ্টা করিতেছিল।

"সিলা! সিলা! শুন্‌ছো? আমি এসেছি; আমি—নিকোলা।" নিকোলা দুই-তিনবার চেষ্টা করিয়াও সিলাকে নড়াইতে পারিল না।

ইতিমধ্যে একজন পুলিসের লোক আসিয়া দোকানের লোকদের জবানবন্দী লিখিয়া লইতেছিল।

দোকানের কর্ত্রী জেরায় যাহা বলিল তাহা মোটামুটি এই :—

হল্‌ম্যান্ বরাদ্দমতো একটা পুরা বোতল এবং তিন গ্লাস শেষ করিয়া আবার হাত বাড়াইল; যে লোকটা মদ দিতেছিল সে ভাবিল বুঝি আবার চাহিতেছে। সেই মুহূর্তেই কিন্তু হল্‌ম্যান্ কেমন অবসন্ন ভাবে বেঞ্চিতে শুইয়া পড়িল, সকলেই ভাবিল লোকটার নেশা হইয়াছে। হল্‌ম্যানের এত নেশা হইতে কিন্তু কেহ কখনো দেখে নাই; যতই মদ খাক না কেন, সে টলিত না; খুব মাতাল হইলে, বড় জোর বাড়ী যাইবার সময়, সঙ্গে একজন লোক লইয়া যাইত, এই পর্যন্ত।

সেল্‌ভিগের দোকানে যাহাদের নিত্য যাতায়াত ছিল শেষ কথাটায় তাহারা সকলেই একবাক্যে সায় দিল।

দারোগা লিখিল—"দোকানে বিশিষ্ট বাঁধা খরিদ্দারেরা সকলেই সাক্ষ্যদান একমত হওয়া বিধায় তাহাদের কথা প্রমাণ ও বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া গৃহীত হইল।"

এই সকল নির্বাক বাঁধা খরিদ্দারের মধ্যে অনেকেই কিন্তু গোলমাল দেখিয়া গোড়াতেই টলিতে টলিতে সরিয়া পড়িয়াছিল। তাহাদের অব্যবহৃত খোলা বোতল এবং ভরা গেলাস এখনো কেহ গুছাইয়া তুলিয়া রাখে নাই।

গোঁফে মোচড় দিয়া দারোগা যাইবার সময় আবার জিজ্ঞাসা করিল, "আর কোনো হেতু নাই তো?"

দোকানের কর্ত্রী প্রথমে এ প্রশ্নের কোনো উত্তর ভাবিয়া পাইল না; শেষে ইতস্ততঃ করিয়া যাহা বলিল তাহার মর্ম কতকটা এইরূপ:

পুরানো খরিদ্দারকে সে বেশি পীড়ন করিতে চায় না, কিন্তু কি করিবে? সে বিধবা, তাহার উপর তাহার দুইটি অবিবাহিতা মেয়েকে প্রতিপালন করিতে হয়; কাজেই, সে আজ হল্‌ম্যান্‌কে বলিয়াছিল যে, এখন হইতে সে আর ধারে মদ দিতে পারিবে না; যদি খাইতে হয় তো নগদ পয়সা ফেলিয়া খাও। সে অনেক কাল অপেক্ষা করিয়া দেখিয়াছে; হল্‌ম্যানের অনুরোধে সে কখনো বাড়ীতে তাগাদা করিতে লোক পর্যন্ত পাঠায় নাই। এ দিকে টাকা তো আর চিরদিন ফেলিয়া রাখা যায় না; কাজেই, জিনিসপত্র নীলাম করিয়া টাকা আদায় করিয়া লইবে—এ কথা সে আজ অনিচ্ছা সত্ত্বেও হল্‌ম্যান্‌কে বলিয়া ফেলিয়াছিল।

এই সময়ে সেই গুণ্ডা-রকমের লোকটা আর দুইজন লোকের সাহায্যে মদের পিপা বহিবার ঠেলা গাড়ীতে ধরাধরি করিয়া হল্‌ম্যানের মৃতদেহ শোয়াইয়া দিল, এবং দোকানের টেবিল-ঢাকা কাপড় দিয়া শব ঢাকিয়া ফেলিল।

খরিদ্দারের শবদেহ এমন করিয়া রাস্তা দিয়া লইয়া গেলে দোকানের দুর্নাম হইবে ভাবিয়া সেল্‌ভিগ্‌-গৃহিণী একখানা কালো রঙের কাপড় খুঁজিতে গেল। না পাইয়া অভাবে একখানা সবুজ রঙের পুরানো পর্দা চাপা দিয়াই মড়া বিদায় করিবার ব্যবস্থা করিল।

কাঁদিয়া কাঁদিয়া সিলার চোখ-মুখ ফুলিয়া উঠিয়াছে। এখন নিকোলা ভিন্ন

তাহার কাছে আর কেহই নাই। চারিদিকে নিস্তব্ধ, কেবল একটা মশা কানের কাছে আসিয়া ক্রমাগত ভোঁ ভোঁ করিতেছে।

অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া নিকোলা বলিল, "তোমার বাপ, তোমার উপর খুশী ছিলেন, আমার উপরও ছিলেন। আমায় যে ভালবাসতেন, একজনের জন্যে, সে কথা তিনি কখনো মুখ ফুটে বলতে পারেন নি।"

সিলা চুপ করিয়া রহিল।

"বাড়ী ফিরতে তাঁর ভারি ভয় ছিল,—আর বাড়ী যেতে হবে না। ভয় ভাঙতে মদের দোকানেও আর ঢুকতে হবে না।"

সিলা উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিতে লাগিল।

নিকোলা কহিল, "শোনো, সিলা, কেঁদো না, চুপ কর। বাপ-মা কারু চিরদিন থাকে না। বাপ গেছে, ভাবনা কি? তোমার ভাবনা ভাববার লোক তোমার কাছেই আছে। এই দেখ না, আমি কখনো বাপের যত্ন পাইনি, বাপ যে কেমন তা' চক্ষেও দেখি নি। আমি নিজে নিজের ভার নিয়েছি, আর তোমার ভার নিতে তো আমি চিরদিনই প্রস্তুত। তোমাকে আমার মনের কথা জানিয়ে রাখলুম। আমি অল্পদিনের মধ্যেই কিছু একটা হয়ে উঠছি। তোমাকে বেশি দিন খেটে খেতে হবে না, সিলা!"

নিকোলার এই সকল কথা সিলার মস্তিষ্কে প্রবেশ করিল কি না সন্দেহ।

"তোমাকে গলির মোড় পর্যন্ত আজ এগিয়ে দেব এখন; রাত্রেও কাছাকাছিই থাকব;—যদি কোনো দরকার হয়—বুঝেছ?"

সিলা ভাঙা গলায় মৃদুস্বরে বলিল, "হাঁ, নিকোলা, তুমি আজ কাছে কাছেই থেকো।"

রাস্তায় লোক চলাচল কমিয়া গেলে, গুণ্ডাটা হল্‌ম্যানের শবদেহ ঠেলা গাড়ী করিয়া দোকানের বাহির করিল। ময়লা কালো পোশাক পরা দুইটা কুলি মড়া কাঁধে করিল; আগে আগে চলিল গুণ্ডাটা, পিছনে সিলা ও নিকোলা।

ছয়

রাজধানীর গলিঘুঁজিতে, আবর্জনার মধ্যে যে সমস্ত ছেলে মেয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে জন্মগ্রহণ করে, সংসারে তাহাদের যে কি গতি হয় তাহা কেহই ঠিক বলিতে পারে না।

বেশির ভাগ যায় মারাত্মক ব্যাধির কবলে। যাহারা টিকিয়া যায় তাহাদের মধ্যে কতক হয় কুলি, কতক ফিরিওলা মুটিয়া, কতক নিষ্কর্মা ভিক্ষুক; কতক গাঁটকাটা, কতক নেশাখোর, কতক বা গুণ্ডা। ইহাদের বিশ্রামের স্থান হয় কয়েদখানা নয় দাওয়াইখানা। আজকাল আবার বড় বড় কারখানাগুলাও ইহাদের আশ্রয় দিতেছে;—এখন একেবারে হাজার দরজা খোলা।

যে সমস্ত ভদ্রলোক ধর্মতঃ ইহাদের ভরণপোষণের জন্য দায়ী তাঁহারা হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছেন; ঘাড়ের বোঝা অনেকটা নামিয়া গিয়াছে। খাটিয়া খাইবার পথ এখন মুক্ত,—হতভাগারা খাটিয়া খাক। তাহার উপর, কারখানার বাঁধাবাঁধিটাকে নৈতিক শাসনের স্থলাভিষিক্ত করিয়া এই দুর্ভাগাদের গুপ্ত মুরুব্বিরা এখন একেবারে লম্বা ছুটি লইয়া বসিয়াছেন।

কৌঁসুলী ভীর্গ্যাঙের একটা কারখানাও ছিল। এই কারখানায় শহরের অনেক অসহায় ছেলে মেয়ে কুলির কাজ করিত।

এই কারখানার একটা ঘরে লেনা, ষ্টিনা, ক্রিস্টোফা, জোসেফা প্রভৃতি অনেকগুলি মেয়ে কুলি সার বাঁধিয়া বসিয়া গিয়াছে। ইহাদের বাপ-মার কোনো খবর ইহারা জানে না, জিজ্ঞাসা করিলেও ভাল করিয়া জবাব দেয় না।

কল চলিতেছে। হাজার হাজার চরকা ঘুরিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে উচ্চৈস্বরে গল্পও চলিতেছে। এঞ্জিনের স্পন্দনে সমস্ত বাড়ীটা কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে।

মেয়ে কুলিদের বয়স ষোল হইতে কুড়ির মধ্যে। ইহাদের ভিতর অনেকেই নবাগত, শিক্ষানবিশ; এখনো ভাল করিয়া কাজের 'বাগ্' বুঝিতে পারে নাই। হল্ম্যানের মেয়ে সিলা এখন এই দলের।

সিলা ক্রমাগত কাশিতেছে, তাই বলিয়া কথা একদণ্ডও বন্ধ নাই। অল্প পরিশ্রমেই বেচারা হাঁপাইতেছে।

জোসেফার নূতন ফুলদার জ্যাকেট লইয়া আজ মেয়েকুলিমহলে তুমুল তর্ক। জ্যাকেট যে উহার 'দাদী' দিয়াছে এ কথা উহারা কেহই বিশ্বাস করে না,

লেনাও না, ষ্টিনাও না, জ্যাকোবিনাও না। ঠিক এই সময়ে ক্রিস্টোফা গত রবিবারের কাহিনী জুড়িয়া দিল। সে যে কেমন করিয়া ভদ্রলোক এবং ভদ্রমহিলাদের বনভোজনে জুটিয়া গিয়াছিল তাহারি একটা আজগুবি বৃত্তান্ত। দুঃখের বিষয় ক্রিস্টোফার এই সমস্ত বৃত্তান্ত যে পরিমাণে শ্রুতিসুখকর সে পরিমাণে সত্য নহে।

ক্রিস্টোফার বর্ণনা শেষ হইলে আগামী রবিবারে লেটুভিগুে যে নাচ হইবে তাহারি জল্পনা চলিতে লাগিল; সিলা একেবারে উৎকর্ণ। কে ভাল নাচে, কাহার পোশাক ভাল, কে পোশাক ধার করিয়া পরিয়া আসে, আর কে বা ভাল খাওয়ায় এই আলোচনাই ঘণ্টাখানেক ধরিয়া চলিল। নাচের সঙ্গে যে এবার বেহালারও বন্দোবস্ত হইয়াছে একথা একা ক্রিস্টোফাই বিশ্বস্তসূত্রে জানিয়াছে। এবারকার নাচে জাহাজের কর্মচারীরা তো আসিবেই, তা'ছাড়া কলেজের ছেলেরাও না কি আসিবে?

এই সময়ে কয়েকজন বাহিরের লোক কারখানা দেখিয়া বেড়াইতেছিল। তাহারা ঘরে ঢুকিতেই মেয়েরা একমনে নিজের নিজের চরকায় তেল দিতে আরম্ভ করিল।

বড় বড় জানালা দিয়া শুষ্ক রৌদ্র আসিয়া কলের চরকীতে, কাপড়ের গাঁটে ও কুলিদের পিঠে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বেলা প্রায় বারটা। শেষ ঘণ্টাটা আর কাটিতে চায় না; তেলের গন্ধ এবং এঞ্জিনের গরম দুঃসহ হইয়া উঠিয়াছে।

এখনো কয় মিনিট বাকী। চারিদিকেই উস্‌খুস্। অবশেষে টিফিনের ঘণ্টা পড়িল।

চক্ষের নিমেষে চুল ঠিক করিয়া ফিট্‌ফাট্ হইয়া মেয়ের দল টিনের পাত্র হাতে টিফিনের জন্য নীচে নামিয়া পড়িল। বাহিরে বসন্তের নির্মল বাতাসে বেচারারা নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। বেড়ার উপরে যে বরফ জমিয়াছিল সিলা তাহাই একটু ভাঙিয়া মুখে দিল। ক্রিস্টোফার নাচের বৃত্তান্ত তাহার মাথার মধ্যে এখনো ঘুরিতেছে।

কারখানার সাম্‌নে রাস্তাটা খুব চওড়া নয়, কাজেই সেখানে অল্পেই ভিড় জমিয়া ওঠে।

"ছাখ্, ছাখ্ ক্রিস্টোফা! ভীর্গ্যাং—ফিরে এসেছে; এরি মধ্যে ইংলণ্ড থেকে ফিরে এসেছে!" সোৎসুক মেয়ের দল গা টেপাটিপি করিতে লাগিল। "নূতন ওভারকোট! ফিকে—ফিকে খাকী!"

"হুঃ! কাল যখন জাহাজ থেকে ও নামছিল আমি তখনি দেখেছি; সঙ্গে কতকগুলো ইংরেজ; সব খাকীরঙের পোশাক। খাকীরঙেরি কত রকম! কাল আমি প্রায় সাত-আটটা রকম গুণেছিলুম—কোনোটা ফিঁকে, কোনোটা ঘোর।"

যে মেয়েটি জিহ্বা ছুটাইতেছিল সে আগে দর্জির দোকানে কাজ করিত, সে জোসেফা।

"এবারে কারখানায় এলে ও পোশাকে ওঁকে খুব সাবধানে চলতে হবে, নইলে যদি তেলকালি কি চর্বি লাগে"—বলিয়া মেয়েরা হাসিয়া উঠিল।

ক্রিস্টোফা বলিল, "ছাখ মিলা ছাখ, কেমন চেহারা! কি চমৎকার মুখ ভাই! বুক-পকেটে আবার কি সুন্দর রুমাল,—লাল টুকটুক্ করছে!"

মেয়েরা কারখানার বেড়ার কাছে ভেড়ার দলের মতো একেবারে ভিড করিয়া দাঁড়াইল।

লাড্‌ভিগ্‌ ভীর্গ্যাং বুক ফুলাইয়া ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে চলিয়া গেল। মেয়ের দল মুগ্ধের মতো চাহিয়া রহিল, তুই-একজন কটাক্ষ করিতেও ভুলিল না। লোকটা লাল স্যামন্ মাছের মতো অবলীলায় জনতার ঢেউ ফুঁক করিয়া চলিয়া গেল।

মেয়েরা বলাবলি করিতেছিল:

"মাথার পিছনে আবার সিঁথে!"

"নূতন ফ্যাসান!"

"আহা অত জোরে নিশ্বাস ফেলো না, বেচারা যে রোগা!"

"ঠিক বাপের মতন হয়ে উঠেছে।"

"কি দেমাক্! কোনো দিকে চাওয়া নেই!"

উহাদের সকলেরি দৃষ্টি লাড্‌ভিগের দিকে।

"যেমন গম্ভীর দেখছ, লোকটি ঠিক অত গম্ভীর নয়। কারখানাতেই গম্ভীর। সেদিন ইস্ত্রি-ঘরের জোহানা বলছিল যে, সে নাকি মেলায় এক মুখোশপরা নাচের মজলিসে ওকে চিনে ফেলেছিল। জোহানা আমাকে নিজে বলেছে।"

জ্যাকোবিনা বলিয়া উঠিল, "কত বড়লোকই যে মেলায় আসে তার ঠিকানা নেই; হয় তো যার সঙ্গে নাচা যাচ্ছে, মুখে তার মুখোশ বলে মনে ভাবা যাচ্ছে, সে বুঝি একজন যে-সে, কিন্তু মুখের কাপড় সরে গেলেই বুঝতে পারবে যে

লোকটা নিতান্ত কেওকেটা নয়। মুখোশ না খুললেও,—অমনিও চেনা যায়, একটু নজর করে দেখলেই ধরতে পারা যায়, জামার কলারে, এসেন্সের গন্ধে, নাচের ভঙ্গিতে—প্রতি পদেই চিনতে পারা যায়।"

"আমাদের দিকে আবার ফিরে ফিরে দেখা হচ্ছিল—তা' দেখেছ?"

সিলা একটু থতমত খাইয়া কহিল, "হ্যাঁ, আমাকে ও চেনে কি না।"

একটা হাসির রোল পড়িয়া গেল, "এই বাচ্চা কাকটাও ডাকতে শিখেছে নাকি?"

বাচ্চা কাকটার শরীর আগুন হইয়া উঠিল, সে কোনো উত্তর করিল না। সিলা বেশ জানিত যে লাড্‌ভিগ্‌ তাহাকে চেনে। সে মায়ের সঙ্গে অনেকবার উহাদের বাড়ী গিয়াছে। এই সেদিনও কারখানায় কাজের জন্য দরখাস্ত লইয়া কৌন্সুলী সাহেবের কাছে যখন যায়, তখন ঐ লাড্‌ভিগ্‌ও সে অফিসঘরে ছিল।

এই সময়ে সকল কারখানারই ছুটি। আর একদল মেয়ে মজুর আসিয়া সিলাদের দলে মিশিয়া দল ভারী করিয়া শহরের নানা বিচিত্র গলি-ঘুঁজির ভিতর দিয়া বস্তির দিকে চলিল। বস্তির কতক ঘর কাঠের, কতক শ্লেটের, কতক খোলার।

সিলা একটা স্যাঁৎসেতে সরু গলির ভিতর ঢুকিয়া পড়িল। উহারা যে ঘরে থাকে তাহার নর্দমা দিয়া গরম ক্ষারজলের ধোঁয়া অল্প অল্প বাহির হইতেছে। ঘরে ঢুকিবার আগেই, সিলা শ্রীমতী হল্‌ম্যানের নীরস কণ্ঠের গুজন-করা কথা শুনিয়া একবার থমকিয়া দাঁড়াইল। ভয়ে-ভয়ে আস্তে আস্তে দুয়ার খুলিয়াই দেখে অ্যাণ্ডার্সনদের ঝি কাপড়ের তাগাদায় আসিয়া রাগে আগুন হইয়া উঠিয়াছে; তাহার মুখ দিয়া কথা বাহির হইতেছে না। এদিকে সিলার মা গরম জলের টবের কাছে দাঁড়াইয়া পরম নিশ্চিন্তমনে কাপড় নিংড়াইতেছে, উত্তেজনার চিহ্ন মাত্রও নাই।

"অ্যাণ্ডার্সন-গিন্নীকে বোলো তুমি যে, এই সব ছেঁড়া গলা কাপড় এক হপ্তায় তৈরী হতে পারে না। অসম্ভব। আমরা যে এত গরীব, আমরাও কখনো, ছেঁড়া ফুটো না সেরে কাপড় ধোপার বাড়ী দিইনে। এই সব কাপড়,—এ স্বোয়ামী-পুত্তুরকে মানুষে পরতে দ্যায় কি করে?···তর্ক করো না বাছা, তর্ক করবার আমার সময় নেই;···আমি বাজে কথা কইনে, খাঁটি কথা কই। দেখ দেখি মোজার ছিরি!···গোড়ালির কাছটা ছিঁড়ে হাঁ হয়ে গেছে,

তা' একটা টোনের দড়ি দিয়ে আটকে রাখা হয়েছে। ছি! ছি! এমন জিনিস হাতে করে কাচতেও লজ্জা করে; বলে—

'শাল দোশালা যেই যা' পরে,
ছাপা সে নেই ধোপার ঘরে।'

অপর পক্ষকে নির্বাক, হতভম্ব দেখিয়া হল্‌ম্যান্‌-গৃহিণী সিলার উপর পড়িলেন—"একটু আগে যদি আসতিস সিলা, তা হলে, আমার একটু কাজের সাহায্য হ'ত; সে দিকে খেয়ালই নেই। আমি 'এখন মলেই ভাল। কর্তা গিয়ে অবধি আমারও আর বেঁচে থাকবার সাধ নেই, মলেই নিষ্কৃতি।"

"আমি সব নিংড়ে টাঙিয়ে দিচ্ছি, মা!"

"থাক না, রাখ; এখন সব হয়ে গেল কি না, এখন এলেন কাজ দেখাতে। কারখানার ছুঁড়ীদের সঙ্গে গল্পটা একটু কমিয়ে, একটু সকাল সকাল এলেই তো হয়! এই যে একটা মানুষ একলা সকাল থেকে ঠায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেটে মরছে, ধর্ম ভেবেও তো তার মুখ চাইতে হয়। ঠিক,—মানুষে পরেরও করে থাকে।"

সিলা চুপ করিয়া রহিল। ঠিক এই সময়ে হতবাক অ্যাণ্ডার্সন-বাড়ীর ঝি বলিয়া উঠিল, "তা' বেশ বাছা, আমাদের কাপড় আর তোমায় কাচতে হবে না। আমরা নিতান্ত সাধারণ লোক. আমাদের সাদাসিধে কাপড়, তোমার মতন অসাধারণ ধোপানীর হাত না পড়লেও বেশ ফর্সা হবে। বলি, জিভে তো এদিকে ক্ষুরের ধার, তবে ক্ষারে কেন ময়লা কাটে না?"

উত্তরের অবসর না দিয়াই দাসী চলিয়া গেল।

হল্‌ম্যান্‌-গৃহিণীর চরিত্রে প্রধান বিশেষত্ব এই যে সে অন্যের অন্যায় একেবারেই দেখিতে পারিত না। বাঁচিয়া থাক সিলা। অদৃষ্টের গুণে তাহার নিজের ঘর কেহ কখনো অপরিচ্ছন্ন থাকিতে দেখে নাই। বিধিবিধানের উৎসর্গ এবং অপবাদ দুই যাহার নিজের হাতে, সুবিধা তাহার চতুর্দিকে।

সময় সকলেরই ফেরে; হল্‌ম্যান্‌ ছুতারেরও ফিরিয়াছিল—মরণান্তে! হল্‌ম্যানেব মৃত্যুর পর হইতে হল্‌ম্যান্‌-গৃহিণী লোকটার যথার্থ মূল্য বুঝিতে পারিয়াছিলেন। মোট কথাটা এই যে, গরীব গৃহস্থের ঘরে একজন পুরুষ মানুষের একটা বাঁধা রোজগার থাকা এবং না থাকা,—এই দুয়ে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। ইহার উপর আবার সেল্‌ভিগের দোকানের দেনা। হল্‌ম্যান্‌ নিজে প্রতি সপ্তাহে হাত-খরচের জন্য টাকা আলাদা রাখিয়াও, কেন যে এত

দেনা করিতে গেল শুধু এই কথাটা শ্রীমতী হল্‌ম্যান্ আজ পর্যন্ত কিছুতেই বুঝিতে পারিলেন না।

যেদিন দেখিলেন যে খাটিয়া খাওয়া, না হয় উপবাস, ইহা ছাড়া সংসারে তাঁহাদের তৃতীয় পন্থা নাই, সেদিন শ্রীমতী হাড়ে হাড়ে জ্বলিয়া গেলেন।

স্বামীর রোজগারের টাকা কেমন করিয়া খরচপত্র করিয়া ফুরাইয়া দিতে হয় ইহাই এত দিন তাঁহার একমাত্র ভাবনা ছিল। এতদিন পরের কাঁধে চড়িয়া বসিয়া ছিলেন, এখন নিজের কাঁধে বোঝা বহিতে হইবে।

এই রকম দুরবস্থায় পড়িয়া, হল্‌ম্যান্-গৃহিণী ভাবিলেন, খাটিতে হয় তো এই তাহার ঠিক সময়,—অথচ কে যে খাটিবে সেটা তেমন স্পষ্ট করিয়া বলা হইল না। সুতরাং বিলম্ব না করিয়া পূর্বপরিচয়েব সূত্র ধরিয়া সিলাকে কারখানায় ভর্তি করিবার জন্য স্বয়ং কৌসুলী সাহেবের কাছে গিয়া হাজির হইলেন।

সমর্থ মেয়ের বসিয়া থাকাটা ভাল নয়। সিলা কারখানায় কাজ করুক, সিলার মাও বসিয়া থাকিবেন না। তিনিও বাড়ী বসিয়া পাড়ার লোকের কাপড় রিফু করিবেন, এমন কি কাচাই-ইস্ত্রিও কিছু কিছু করিবেন। ইহার পরেও যদি লোকে তাঁহার নিন্দা করে তবে সেটা কেবল লোকের স্বভাবের দোষ।

হল্‌ম্যান্-গৃহিণী কন্যার নাকে দড়ি দিয়া দুই জনের খাটুনি খাটাইয়া কর্তব্য পালন করিতেছিলেন। কারখানায় পুরাদমে খাটিয়া আসিয়াও সিলার নিস্তার ছিল না। সমর্থ মেয়ের বসিয়া থাকিতে নাই। সমস্ত সন্ধ্যাটায় কেবল সেলাই আর তালি, তালি আর সেলাই; অমনি করিয়াই তো মানুষ ধীর শান্ত হয়, নহিলে ঘোড়ার মতো লাফাইয়া বেড়ানো কি ভাল?

টিম্‌টিমে তেলের আলোয় যতক্ষণ বেচারা সেলাই-ফোঁড় করিত ততক্ষণই কেবল কারখানার মেয়েদের বনভোজনের আর নাচের গল্প ছায়াবাজীর ছবির মতো সজীব হইয়া তাহার মনের ভিতরে ঘুরিতে থাকিত। তাহার মনে হইত এসব যেন তাহার নিজের জীবনের ঘটনা; তাহার মন ভরিয়া উঠিত, বুদ্বুদের পর বুদ্বুদ,—আহ্লাদের আতিশয্যে সিলা এক একবার মায়ের সম্মুখেই হাসিয়া ফেলিত। ময়লা একটা মোজার মধ্যে মজাটা যে কোথায়, এবং এত হাসিই বা কোথা হইতে আসে, হল্‌ম্যান্-গৃহিণী অনেক মাথা ঘামাইয়াও কোনো মতেই তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেন না। মেয়েটার সবই অদ্ভুত।

সাত

হীগবার্গের লোহার কারখানায় এবার 'ফাঁকা সোমবারের' উপর 'ভ্যাস্তা মঙ্গলবার' হইতে চলিয়াছে। রবিবারের বন্ধের পর মিস্ত্রি মজুর কাহারও দেখা নাই। অতবড় কারখানায় মোটে একটি ছোকরা হাজির।

নূতন ডকের দরুন রাশীকৃত কোদাল, গাঁতি, কুড়ুল প্রভৃতি শানাইবার অপেক্ষায় পড়িয়া আছে। সেগুলার উপর প্রায় এক আঙুল পুরু ধুলা। হীগবার্গ তো রাগে আগুন। ভাল লোক আর পাইবার জো নাই, সব হতভাগা। শিক্ষানবিশ ছোকরাদের সব সে তাড়াইয়া দিবে। মিস্ত্রিদেরও জবাব দিতে ছাড়িবে না। ইহা যদি না করে, তবে তাহার নাম হীগবার্গ নয়।

যে ছোকরাটি আজ কাজে আসিয়াছে, সে ছুটির দিনেও কাজে আসে। সে চটপট মিস্ত্রি হইতে চায়। দুনিয়ার গতিকই এই; কেহ বা এক সপ্তাহের রোজগার একদিনে উড়াইয়া দেয়,—মদ গিলিয়া কাজ কামাই করে; আর কেহ বা ছুটির দিনে খাটিয়া,—পেটে না খাইয়া, একটি একটি করিয়া পয়সা জমাইয়া গৃহস্থালীর গোড়াপত্তন করে। ছোকরাটি কাজের লোক বটে,—যদি পুলিসের ফ্যাঁসাদে না পড়িত, তাহা হইলে কোনো কথাই বলিবার ছিল না। হাঁ,···তবে···পুলিসের হাতেও ছোকরা বেকসুর খালাস পাইয়াছে। সে যে দোষী, এমন কথা কেহ জোর করিয়া বলিতে পারে না।

যাহার কথা হীগবার্গ আলোচনা করিতেছিল, সে নিকোলা। নিকোলা আবার কামারের কাজে ভর্তি হইয়াছে। এবার সে ওস্তাদ না হইয়া ছাড়িবে না।

এতক্ষণে, গদাই-লস্করী চালে দুইজন কারিগর এতক্ষণে কারখানায় আসিয়া হাজির হইল।

হীগবার্গ দেখিয়াও দেখিল না; সে হাপর হইতে একখানা গরম গাঁতি টানিয়া লইয়া হাতুড়ির আঘাতে আগুন বৃষ্টি করিতে লাগিল।

ওস্তাদ হইয়া চুল পাকাইয়া হীগবার্গ আজ কুলির কাজ করিতেছে! কারিগর দুইজন ইহাতে মনে মনে ভারি লজ্জা বোধ করিতেছিল। তীব্র তিরস্কারেও উহারা এত লজ্জিত হইত কি না সন্দেহ।

কারিগরেরা ক্রমশঃ দুই-একজন করিয়া কারখানায় আসিয়া জুটিতে লাগিল। কাহারও মুখ অত্যন্ত লাল; কাহারও একেবারে ফ্যাকাশে; কাহারও চোখের কোলে কালশিরা; কাহারও নাকের উপর ন্যাকড়ার পটি বাঁধা। সকলেরি গলা ভাঙা। সকলেই আস্তে আস্তে কাজে বসিয়া গেল। এত কাজ জমিয়া গিয়াছে যে, হাড়ভাঙা খাটুনি না খাটিলে সমস্ত দিনেও তাহা সাবাড় হইবার সম্ভাবনা নাই।

সমস্ত দুপুরবেলাটা নীরবে কাজ চলিল। বৈকালের দিকে কাজ অনেকটা হাল্কা হইয়া আসিয়াছে দেখিয়া, হীগবার্গ তাগাদায় বাহির হইয়া গেল।

এই সময়ে ঘর্মাক্ত কারিগরদের মধ্যে একজন গুন্ গুন্ করিয়া গান ধরিল, জন দুই অলসভাবে আড়ামোড়া দিয়া হাই তুলিল। কামাইয়ের দিনটা কে যে কেমন করিয়া কাটাইয়াছে, প্রত্যেকের মুখে এখন তাহারই বর্ণনা।

একা নিকোলা উহাদের গল্পে যোগ দেয় নাই। সে কতকগুলা কব্জায় ইস্ক্রুপ পরাইবার জন্য বিঁধ করিতে ব্যস্ত। সমস্ত সপ্তাহে তাহার হাতের কাজ সারা হইবে কি না সন্দেহ। গল্পে যোগ দিবার সময় তাহার মোটেই নাই।

মিস্ত্রিরা বহ্নি-উৎসবের গল্প করিতেছিল। কে কয়টা পুরানো আলকাতরার পিপা পুড়াইয়াছে, পকেট খালি করিয়া সমস্ত পয়সা মদে উড়াইয়াছে,—তাহারি বিস্তৃত কাহিনী। জান্ পিটার আবার নৌকায় চড়িয়া জলটুঙ্গিতে গিয়াছিল, পাহাড়ের কত জায়গায় বন পোড়ার আগুন সে দেখিয়া আসিয়াছে।

এত গল্পগুজবের মধ্যে নিকোলার ছোট হাতুড়িটির শব্দ মুহূর্তের জন্যও বন্ধ নাই।

জান্ পিটারের কথা ফুরাইতে না ফুরাইতে আর একজন লোক গল্পের আসর জমাইয়া তুলিল—"গ্রীফসেন পাহাড়ে এক রকম বিনামূল্যেই কাল মদ বিতরণ হয়েছিল। মদের ঝরণা ঝরেছিল বললেই হয়। ভীর্গ্যাং সাহেবের ছেলে—কলের মেয়ে মজুরদের সকলকে একেবারে খুশী করে ছেড়ে দিয়েছে। তারা আস্ত একখানা পুরানো নৌকা প্রায় আধ পিপা আলকাতরা দিয়ে পুড়িয়েছে। সমস্ত রাত গান-বাজনা। আজ বেলা আটটার পর সেখান থেকে নেমে আসা গেছে।"

হাতুড়ি নীরব হইয়া গেল। 'ভীর্গ্যাং সাহেবের ছেলে! কলের মেয়ে' নিকোলা কান খাড়া করিয়া রহিল। যে লোকটা গল্প জুড়িয়াছিল,

তাহার বর্ণনা শেষ না হইতেই, হাত-মুখ ধুইয়া নিকোলা তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল।

*　　　*　　　*

সিলা গোয়ালাবাড়ী হইতে দুধ কিনিয়া বাহির হইতেছে, এমন সময় দরজার কাছে নিকোলার সঙ্গে সাক্ষাৎ। সিলা বেশ জানিত নিকোলা উহারি সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছে, নিকোলা কিন্তু বলিল অন্যরূপ। সে বলিল, "গোয়ালাবাড়ীতে তোমায় ঢুকতে দেখলুম, তাই দাঁড়িয়ে আছি।"

"কাল যে কি মজাই হয়েছিল তা আর তোমায় কি বলব নিকোলা!" সিলা দুধের পাত্র মাটিতে নামাইয়া বলিতে লাগিল, "এমন মচ্ছব আমি জন্মে দেখিনি!"

"গ্রীফসেন পাহাড়ে?"

"তুমি জানলে কি করে? তুমি কি করে জানলে? অ্যাঁ! বল, তুমি জানলে কি করে?"

"আমি,—আমাদের একজন কারিগর,—সেও গিয়েছিল,—সেই বললে। আচ্ছা তুমি তোমার মার কাছ থেকে ছাড় পেলে কেমন করে?"

সিলা চকিতের মত একবার চারিদিক দেখিয়া আস্তে আস্তে বলিল, "সেও ভারি মজা। মা গিয়েছিল মাসীর বাড়ী সেণ্ট জনের প্রসাদ খেতে। আমায় বলে গেল, 'বাড়ী আগলে থাকিস্, আর কাপড়গুলো ইস্ত্রি করে রাখিস্।' নটা বাজতে না বাজতে আমিও মেলা দেখতে বেরিয়ে গেলুম।"

সিলা হাসিতে লাগিল। "বেলা পর্যন্ত আমায় ঘুমুতে দেখে, মাসীর বাড়ী থেকে সকালে ফিরে এসেই মা খুব খানিক আমায় বকে দিলে।...আমরা আবার রাত্রে কেমন শরবৎ খেয়েছিলুম, তা' শুনেছ?"

"খাওয়ালে কে?"

"বলব? আচ্ছা, তোমায় বলছি, কিন্তু কাউকে বলো না। খাইয়েছিল একজন লোক"—

"বটে!"

"সে বড় যে-সে নয়,—ভীর্গ্যাং সাহেবের ছেলে,—সেও বন-পোড়া দেখতে এসেছিল।"

"সে তোমাদের শরবৎ খাইয়েছে?—তোমাকেও খাইয়েছে?"

"হ্যাঁ! আমায় দেখিয়ে দোকানীকে বললে, 'ওই-যার-কালো চোখ—ওকে ভাল করে শরবৎ তৈরী করে দাও।"

"আগে থেকেই আলাপ হয়েছে বোধ হয়?"

"হ্যাঁ! সে জানে আমার নাম সিলা, তবুও বলছিল, 'ওই-যার-কালো-চোখ।' ওর সঙ্গে আমার রোজই দেখা হয়, তা বুঝি জান না?"

"বটে!" নিকোলার মুখ কালি হইয়া উঠিল।

"শনিবারে মাহিনা দেবার সময়, সে আমার হিসাবে দু'শিলিং বেশি জমা করে ফেলেছে। শেষে আর কি হবে? হিসাব তো কাটাকুটি করা চলে না,—তাই বললে, 'ও দু'শিলিং তোমায় আলাদা দিয়ে দেব; তুমি কেক্ টেক্ কিনে খেয়ো।"

"হাঃ! হাঃ! তাই বললে নাকি? খুব তো তার দয়া! কসাইদেরও খুব দয়া! কাটবার আগে মুরগীর সামনে মটর ছড়িয়ে দেয়, নইলে যে মুরগী ধরাই দেয় না!"

নিকোলা যতক্ষণ কথা কহিতেছিল, ততক্ষণই সে সিলার দিকে একদৃষ্টিতে তাকাইয়া ছিল। সিলা ক্রমশঃ কি সুন্দরীই হইয়া উঠিয়াছে! যেমন মুখ তেমনি গড়ন! নিকোলা বলিয়া উঠিল, "কি বোকা মেয়ে! নিজে যে সুন্দরী সে কথাটাও নিজে জানে না।"

সিলার ঠোঁট ফুলিয়া উঠিল। সে যে বোকা, এ কথাটা সে মোটেই আমল দিতে চায় না।

"একখানা রুমাল, একখানা কেক পেলেই খুশী; বোকা মুরগীর মতো গলা বাড়িয়ে দেয়, যে খুশী ছুরি চালাতে পারে। এত দেখ-শোনো, এটুকু বুদ্ধি তোমার হওয়া উচিত, সিলা! যে মেয়েদের সঙ্গে তুমি বেড়াও, ওদের আচরণ কি তোমার ভাল লাগে? ওদের একজনকেও কি কোনো ভদ্র রকমের কারিগর বিয়ে করতে চাইবে? না, ওরা তার উপযুক্ত? দু'দিন ফুর্তি,—ব্যস্, তার পর সব ফর্সা। কোনো ভদ্র পরিবারে ওদের বসতেও জায়গা দেবে না। আর ঐ যে ভীর্গ্যাং সাহেবের ছেলে—ওকে আমার ভাল মনে হয় না সিলা! ও তোমার জন্যে ঠিক 'ওৎ' পেতে আছে। আমিও ওর জন্যে 'ওৎ' পেতে আছি।" নিকোলার মুখ আবার ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল।

"তুমি কী বলছ নিকোলা?...কি ঠাউরেছ মনে মনে...বল দেখি?...আমি তোমার ভাব কিছু বুঝতে পারিনে। কী যে বল তার ঠিক নেই।"

"কি যে মনে করছি তা' তুমিই বুঝে দেখ। তোমাকে বাঘ-ভালুকের মুখের সামনে ছেড়ে দিয়ে সারাটা দিন কেবল হাতুড়ি পিটব আর উখো ঘষব —এতে সুখও নেই, স্বস্তিও নেই। আমার আজন্ম ঐ রকমই চলছে।—আমার ভাগ্যে সবই উল্টো।"

সিলা মাথা হেঁট করিয়া রহিল। নিকোলার এই সব কথা তাহার মোটেই ভাল লাগিত না।

নিকোলা কম্পিতকণ্ঠে বলিতে লাগিল, "আমরা দুজনে, সিলা, বলতে গেলে, একসঙ্গে মানুষ হয়েছি। আর যে হাঙ্গামার মধ্যে মানুষ হয়েছি তা' তোমার সবই জানা আছে। আমি বেটাছেলে, আমার পক্ষে বিগ্‌ড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি ছিল না, কেননা, অত্যাচারে আমি দমে যেতুম না, আমার মনের জোর ছিল, জবাব দিতে পারতুম। কিন্তু তুমি দুর্বল, তোমার পক্ষে বিগ্‌ড়ে যাবার সম্ভাবনাই বেশি ছিল। অনেক মিথ্যা তোমায় মাথা পেতে মেনে নিতে হয়েছে; অনেক কষ্টে মন পরিষ্কার রাখতে হয়েছে। সেই জন্যে—সেই জন্যে ভেবেছিলুম—যখন বরাবর আমরা পরস্পর পরস্পরের দোষ ঢেকে এসেছি, বরাবর পরস্পরকে সাহায্য করেছি, তখন আমাদের উচিত হচ্ছে চিরকাল একত্র থাকা, পরস্পরের হাত ধরে সংসারের বাধা বিঘ্নের ভিতর দিয়ে পরস্পরকে বাঁচিয়ে চলা। আমাদের উচিত হচ্ছে, একটা সম্বন্ধে আবদ্ধ হওয়া...বিয়ে করা। তোমার যদি আপত্তি না হয়, তবে—"

সিলা চুপ করিয়া রহিল। উহাকে মৌন দেখিয়া নিকোলা কতকটা সাহস পাইল। সে আবার বলিতে লাগিল—"এখন আর আমি এক পয়সাও বাজে খরচ করিনে। জলপানির হিসাবে যা পাই, সব এখন থেকে জমিয়ে রাখছি। অল্পদিনের মধ্যেই আমি একজন কারিগর হয়ে উঠব। তখন চাই কি, তোমাকে আর কলে গিয়ে কালিঝুলিও মাখতে হবে না, বাড়ীতে মার কাছে বকুনিও খেতে হবে না,—তখন সিলা, তুমি হবে কারিগরের স্ত্রী। তোমাকে কেউ কখন যত্ন করেনি, আমি তোমায় যত্ন করব,—খুব যত্ন করব। ছেলেবেলায় যেমন করতুম ঠিক তেমনি। তা'ছাড়া আমি কখনো মা-বাপের আদর-যত্ন পাইনি, তাদের ভালবাসবারও অবসর পাইনি। সঙ্গী?—তাও পুলিসের হাঙ্গামার পর থেকে বড় বেশি নেই।" —নিকোলা একবার থামিয়া আবার বলিতে লাগিল, "তুমি, সিলা, কারিগরের স্ত্রী হলে ভারি চমৎকার হবে। কামারের মনের মতন চোখ যদি কারো থাকে,—সে তোমার। চোখ

নয় তো যেন হাপরের আগুনের ফুল্‌কি! কাজ থেকে যখন ফিরে আসব, দরজায় না ঢুকতেই তোমার মুখ দেখতে পাব। কেমন হবে! চিরকাল কুকুরের মতো থেকেছি—কুকুরের অধম চোরের মতো হয়ে থেকেছি—এখন যদি শুধু তোমায় পাই তো সব দুঃখ ভুলে যাব, খুব সুখে দিন কাটবে। জাহাজী গোরাদের সঙ্গে আর ছোকরা বাবুদের সঙ্গে নেচে বেড়ানোর চেয়ে, নিজের সিন্দুকে তালা লাগিয়ে নিজের ঘরে জোরের সঙ্গে থাকা ঢের ভাল, সিলা,—সে ঢের ভাল।"

শেষ কয়টা কথা না বলিলেই ভাল ছিল। সিলা ভিজিয়াছিল; নিকোলার শেষ কয়টা কথায় সে আবার গরম হইয়া উঠিল, সে বেশ একটু চটিয়া উঠিল। সিলা বলিল—"তুমিও আমায় হেসেখেলে বেড়াতে দেবে না? আমি কোথাও যাব না, কারো সঙ্গে কথা কইব না?—এই কি তোমার ইচ্ছে? ছেলেবেলা থেকে মা যেমন করে খাঁচায় পুরে রেখেছে, তুমিও তেমনি রাখবে?" সিলা কাঁদিয়া বলিল, "নিকোলা, তুমি এমনি করে আমায় সুখী করবে? তোমার এইসব কথায় আমার মন ভারি খারাপ হয়ে যায়। এইসব কথা শুনলে তোমাকেও আমার কেমন ভয় করে।"

"আমাকে ভয় করে? সিলা!"

"কলের মেয়েরা সবাই আমায় ঠাট্টা করে—বলে, 'খুকী, মায়ের আঁচল ধরে বেড়াওগে।' তুমিও এখন মায়ের দিকে হলে? বেশ! বেশ! খুব ভাল! সবাই মিলে আমায় জব্দ করে রাখ। যতদিন মার অধীন আছি, মা জব্দ করে রাখুক। যখন তোমার হাতে পড়ব, তখন তুমিও তাই কোরো। এরকম কিন্তু ভাল নয় নিকোলা। এ আমি কিছু চিরদিন সইব না।"

সিলা রাগে, দুঃখে অভিমানে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

"আচ্ছা, কাঁদ, আমি কিছু বলব না, বলতে চাইও না। এখন তোমায় সান্ত্বনা দেবার আরো ঢের লোক হয়েছে।"

সিলা সহসা চোখ মুছিয়া নিকোলার কাছে গিয়া ধীরে ধীরে তাহার কাঁধের উপর হাত রাখিল এবং আর্দ্র চক্ষে তাহার দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "তোমায় ছাড়া আমি আর কাউকেই তো বিয়ে করব না, এ কথা কি তুমি জান না? নিকেলা!"

সিলার চোখে আবার জল ভরিয়া উঠিতেছিল।

"সে তো বেশ কথা, সিলা! সে তো ভাল কথা। আমিও দেখাব যত্ন

কাকে বলে। ভালবাসলে লোকে যে কতদূর পর্যন্ত কাজের লোক হয়, তাও তোমার অগোচর থাকবে না।”

“কিন্তু নিকোলা, মাকে আমার ভারি ভয়। যদি জানতে পারে যে, লুকিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করি, তা হলে রক্ষে থাকবে না। কোনো কাজের অছিলায় বাইরে দেরী হলে মা এম্‌নি করে চায় যে আমার বুক শুকিয়ে যায়। সন্ধ্যাবেলা রোজ ছেঁড়া কাপড় সেলাই করি, তখন এক একদিন মনে হয় তুমি যেন বড়লোক হয়েছ।—হীগবার্গের কামারশালার মালিক হয়ে আমাদের বাড়ীতে এসেছ। এ যদি হয়, তা হলে আর মা অমত করতে পারবে না।”

“না, না! সত্যি?—তুমি এই সব ভাব? সিলা! সত্যি? আসব, নিশ্চয় আসব। বড়লোক হয়ে না হোক, পাকা কারিগর হয়ে তোমাদের বাড়ী আসব। তা হলেও তোমার মা আর অমত করতে পারবে না।”

এ কি! পড়ন্ত রৌদ্র আজ এমন উজ্জ্বল হইল কি করিয়া? উদ্ভিন্ন পল্লবের ভারে গাছের শাখা যে ভরিয়া উঠিল। পুলের তলে জলের কল্লোল আজ ঠিক কলহাস্যের মতোই শুনাইতেছে। নিকোলা তো নেশা করে নাই। মধ্যনিদাঘের প্রশান্ত সন্ধ্যা সহসা চঞ্চল হইয়া উঠিল যে!

দুধের পাত্র হাতে লইয়া সিলা দেখিতে দেখিতে দূরে চলিয়া গেল। নিকোলার দিকে চাহিতে চাহিতে সে বাড়ীর অরণ্যে হারাইয়া গেল।

মোটের উপর দুনিয়াটা জায়গা নেহাৎ মন্দ নয়। কুলুপের কলের মতো মাঝে মাঝে খারাপ হইয়া যায় বটে, কিন্তু মোটের উপর খতাইয়া দেখিলে ইহাকে নিতান্ত খারাপ বলা চলে না। আর বিগ্‌ড়াইলেই বা এমন কী ক্ষতি? একটু হাত দুরস্ত হইলে, একটু ধৈর্য থাকিলে, সব ঠিক হইয়া আসে।

না, দুনিয়া বেশ জায়গা, খাঁটি জায়গা। একটু ভিতরে প্রবেশ করিলেই সেটা স্পষ্ট বোঝা যায়। বাহিরে পুলিস পাহারা, ওস্তাদ-উপরওয়ালা; তাও ঐ কুলুপের কলটা ঠিক রাখিবার জন্য।

* * *

নিকোলা এইবার পাকা মিস্ত্রি হইল। সার্টিফিকেট পাইল। পৃথিবী তাহার কাছে গোলাপী রঙে রঙীন হইয়া উঠিল। সংসারের সঙ্গে আজকাল যে তাহার বেশ বনিবনাও হইতেছে, সে যে বেশ মানাইয়া চলিতে শিখিয়াছে,

সে কথা এখন তাহার উজ্জ্বল প্রশস্ত মুখের পরতে পরতে লেখা। এখন সে সকল কাজই বেশ সহজ দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করিতে পারে।

মিস্ত্রি হইয়া তাহার মাহিনা বাড়িয়া গেল। পাশ বহিতে প্রতি সপ্তাহেই বেশ কিছু জমিতে লাগিল। শ্রীমতী হল্‌ম্যানের ভয়ে সে এখনও সিলাকে কোনো জিনিস উপহার দিতে সাহস করে না, সুতরাং বাজে খরচ একটি পয়সাও নাই। যে পয়সাটা বাঁচানো যায় সেইটাই লাভ ; আর আজই হোক, দুই দিন পরেই হোক, এ সবই তো সিলার।

শনিবারের বৈকালে কারখানার ছুটি হইয়া গেলে, সে কাজের সাজে সিলাদের পাড়ার দিকেই যাইত ; যেন কাজের খোঁজে চলিয়াছে। যাইবার সময় হাতুড়ি, সাঁড়াশি কিংবা একটা কুলুপ হাতে লইতে ভুলিত না। মনের কথাটা সিলার সঙ্গে দেখা করা ; নির্ভর দৈবের উপর।

দেখা হইত দৈবাৎ। এক একবার সিলার বদলে সিলার মার সঙ্গেও চোখাচোখি হইয়া যাইত। নিকোলা পাশ কাটাইয়া সরিয়া পড়িত। কোনো দিন দেখিত, সিলা মেয়ে মজুরদের সঙ্গে টো-টো করিতেছে। দেখা না হওয়া বরং সহ্য হয়. কিন্তু অন্য মেয়ে মজুরদের সঙ্গে সিলাকে একত্র দেখা নিকোলার পক্ষে একেবারে অসহ্য।

এই হতভাগা মেয়েগুলোর সঙ্গে সন্ধ্যাবেলা বেড়াইবার কী দরকার? সিলার মতো মেয়ের এ কি ভাল দেখায়? বেচারীর বয়স কম, বুদ্ধিও কাঁচা, এদের সঙ্গে মিশিবার যে কী পরিণাম তাহা সে বোঝে না। ভদ্রলোকের ছেলেদের ভদ্রতার যে কী মর্ম তাহা সিলা এখনো তলাইয়া দেখে নাই। উহাদের শিষ্টতা যে শুধু সুন্দর মুখেরই জন্য তাহা সে এখনো জানে না। আমোদ-আহ্লাদ করিতে চায়,—করুক। ঘানিতে পড়িলে গুঁড়া হইয়াই বাহির হইবে।

নাঃ! সিলাকে এই সুদুস্তর পঙ্ক হইতে তুলিতেই হইবে।

নিকোলা এখন চোখ-কান বুজিয়া কেবল হাতুড়ি পিটুক, উখো ঘষুক, পয়সা জমাক। রূপার বঁড়শীটা বেশ একটু বড় না হইলে সিলাকে গাঁথিয়া তোলা মুশকিল,—ভারি মুশকিল।

আট

মিস্ত্রি হইবার কিছুদিন পরেই মাতৃস্নেহে বঞ্চিত নিকোলা মাকে ফিরিয়া পাইল। হঠাৎ একদিন বার্বারা আসিয়া হাজির। নিকোলা যে এখন রোজগার করিতে শিখিয়াছে, সে খবর বার্বারা গ্রামে বসিয়াই পাইয়াছে। একখানা তক্তা বোঝাই গাড়ী শহরে আসিতেছিল, উহার গাড়োয়ানকে বলিয়া কহিয়া ঐ গাড়ীটাতে চড়িয়াই বার্বারা শহরে আসিয়াছে। বেচারী ভারী খুশী। সে নিকোলার জন্য কত কাঁদিয়াছে,—বলিতে বলিতে সত্য সত্যই সে পাটকরা রুমাল দিয়া পুনঃপুনঃ অশ্রু মার্জনা করিতে লাগিল।

বার্বারা অনেক দুঃখ সহ্য করিয়াছে ; তবে ছেলে যখন মানুষ হইয়াছে,— ছেলেকে যখন সে ফিরিয়া পাইয়াছে, তখন আর ভাবনা নাই। নিকোলা এখন কত বড়টি হইয়াছে। বলি, গির্জায় যাইবার মতো ভাল জামাজোড়া তৈয়ার করাইয়াছে তো ? একটা টুপি তাহাকে কিনিতেই হইবে। এসব বিষয়ে মার কথা শুনিতেই হইবে। অবস্থার মতো ব্যবস্থা নহিলে লোকে কি বলিবে ? বার্বারা পোশাক-পরিচ্ছদ সম্বন্ধে নিকোলাকে যথেষ্ট উপদেশ দিতে পারিবে। সে সংসারের অনেক দেখিয়াছে।

নিকোলা মার উপর খুশী হইবে কি চটিবে তাহা ভাবিয়া পাইল না। বার্বারার আকস্মিক আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে খরচ এবং বাজে খরচ অনেক বাড়িয়া উঠিল।

নিকোলা বহুবৎসর মাকে দেখে নাই ; মাতার যে ছবি তাহার অন্তরে অঙ্কিত ছিল, তাহাও অজস্র অশ্রুপাতে লুপ্তপ্রায়। পুরানো স্মৃতি খোঁচাইয়া তুলিবার ইচ্ছাও তাহার খুব বেশি প্রবল ছিল না। কারণ, নিকোলার পক্ষে পূর্বস্মৃতি 'আগাগোড়া কেবল মধু' নহে। সে বর্তমানের স্বচ্ছ স্বাচ্ছন্দ্যের মাঝখানে অতীতের আবিলতা ঘোলাইয়া তুলিতে রাজী নয়। মনে মনে কিন্তু নিকোলার মার প্রতি একটা টান আছে, এ কথা সে অস্বীকার করিতে পারে না। সে মাকে ভালবাসে, সুতরাং মা আসিয়াছে,—ভালই।

একটা শনিবারের অপরাহ্নে নিকোলা কর্মস্থান হইতে ফিরিয়া মাকে সঙ্গে করিয়া বেড়াইতে বাহির হইল। সে হোটেলে গিয়া বার্বারাকে দামী রুটি এবং মাংস কিনিয়া খাওয়াইল। বার্বারা খাইতে পারে বেশ। শেষে ঠিক পুরাপুরি ইচ্ছা না থাকিলেও আনন্দের ক্ষণিক আতিশয্যে, সে সমস্ত সপ্তাহের

সঞ্চিত অর্থে বার্বারার জন্য একখানি প্রকাণ্ড ফুলকাটা রেশমী রুমাল কিনিয়া ফেলিল। বার্বারা জিনিসটা পছন্দ করিয়াছে, সুতরাং নিকোলা সেটা না কিনিয়া থাকিতে পারিল না।

নিকোলার টাকার থলি ক্রমশই হাল্কা হইয়া পড়িতেছে। উপায় কি? বার্বারা কোনো দিন বুঝিয়া চলিতে অভ্যস্ত নয়। সাত-পাঁচ ভাবিতে ভাবিতে বিদায়ের দিন বার্বারাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া সন্ধ্যার ঝোঁকে নিকোলা সিলার সন্ধানে চলিয়া গেল।

শহরের মলিন দরিদ্র পল্লীতে সন্ধ্যার ঘোর সকলের আগেই ঘনাইয়া উঠিয়াছে। গ্রীষ্মাতিশয্যে মুটে-মজুরের দল গায়ের জামা কাঁধে ফেলিয়া চলিয়াছে। কোনো কোনো কারখানায় হাতুড়ির শব্দ এখনো বন্ধ হয় নাই।

আজ সিলাদের পাড়ার সমস্ত অলিগলি ঘুরিয়াও নিকোলা সিলাকে দেখিতে পাইল না। ফুটপাথে উঠিল, রাস্তায় নামিল,—অনেকক্ষণ ধরিয়া এদিক ওদিক করিল। সিলার দেখা নাই। একটি মেয়ে দুধের বালতি হাতে লইয়া যাইতে যাইতে নিকোলাকে এইরূপ ঘুরিতে দেখিয়া হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। নিকোলা আর দাঁড়াইল না। তাহার মনে হইল, সবাই উহাকে লক্ষ্য করিতেছে,—হয় তো সকলে ভাবিতেছে, লোকটা না-জানি কি মতলবে প্রায়ই এমন করিয়া এখানে ঘুর-ঘুর করে।

দূরে 'পানি-চক্কী'র আবর্তনে ঝরণার জল ছড়াইয়া পড়িতেছে। একখানা গাড়ী ঘড়্ ঘড়্ শব্দে গস্তব্যস্থানে ছুটিয়া চলিয়াছে। খানিক দূর গিয়া মাল খালাসের জন্য গাড়ীখানা দাঁড়াইল। প্রকাণ্ড বোঝা,—এক ঝাঁকানিতে একেবারে রাস্তায়। মালটা ভীর্গ্যাং সাহেবের কারখানা সংলগ্ন বাগানের ফটকে খালাস করা হইল। বাগানের ভিতরে একটা লোক মোটা নলে করিয়া জল ছিটাইতেছে, আর কতকগুলা মেয়ে ঘাস নিড়াইতেছে, আগাছা তুলিয়া সাফ করিতেছে, নূতন চারা রোপণ করিতেছে। খোলা জানালায় দাঁড়াইয়া লাড্‌ভিগ ভীর্গ্যাং উহাদের সঙ্গে হাস্যালাপে একেবারে মশ্‌গুল। মেয়েদের মাঝখানে শ্রীমতী হল্‌ম্যান্ দণ্ডায়মান।......সিলাও আছে। লাড্‌ভিগ্ উঁহাকে লক্ষ্য করিয়া হাসি-তামাশা করিতেছে। সিলাও হাসিতেছে...কিন্তু হল্‌ম্যান্-গৃহিণীর ভয়ে জবাব দিতে পারিতেছে না।

নিকোলার হৃৎপিণ্ডটা কে যেন হঠাৎ এক গোছা দস্তুর সাঁড়াশি দিয়া সজোরে চাপিয়া ধরিল। সে যে একদিন লাড্‌ভিগ্‌কে প্রহার দিবার সুযোগ

পাইয়াছিল, সেই কথাটাই আজ সকলের আগে তাহার মনে জাগিতেছিল। নিকোলার বুক যেন কিসে চাপিয়া ধরিতেছিল। সে উহাদের উপর নজর রাখিবার জন্য একটু তফাতে গিয়া একটা গাছের আড়ালে বসিয়া পড়িল।

'সিলা হাসিলে কি সুন্দর দেখায়'—নিকোলা বসিয়া বসিয়া তাহাই ভাবিতেছিল, আর ভাবিতেছিল তার সমস্ত দুঃখের কারণ লাড্‌ভিগ্‌ ভীর্গ্যাঙের কথা।

বসিয়া বসিয়া প্রায় এক ঘণ্টা কাটিয়া গেল। নিকোলা লোকের আনাগোনা দেখিতেছে। হাবার মতো, হাদার মতো সকলের মুখের দিকে তাকাইয়া দেখিতেছে। হঠাৎ তাহার চেহারা ভীষণ হইয়া উঠিল। ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে লাড্‌ভিগ্‌ ভীর্গ্যাং একেবারে নিকোলার সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল। যতক্ষণ উহাকে দেখা গেল, রুদ্ধ আক্রোশে নিকোলা ততক্ষণই শৃঙ্খলাবদ্ধ পশুর মতো তাহার দিকে ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

আবার সেই নৈরাশ্য, দরিদ্রের সেই চিরসঙ্কোচ, সেই চিরদাস্য, ধনীর সঙ্গে নির্ধনের প্রতিযোগিতায় সেই চিরন্তন নিষ্পেষণ···নিকোলা চক্ষু মুদ্রিত করিল; সে প্রাণপণ বলে আত্মসংবরণ করিল।

যখন সে চোখ খুলিল, তখন শ্রীমতী হল্‌ম্যান্‌ ঘরে ফিরিতেছেন—সঙ্গে সিলা।

খানিক দূরে দু'জনে দুই পথ অবলম্বন করিল। হল্‌ম্যান্-গৃহিণী বাড়ীর দিকে গেলেন, সিলা চলিল গোয়ালা-বাড়ী।

দুধ লইয়া ফিরিবার সময় হঠাৎ নিকোলার সঙ্গে চোখোচোখি হওয়ায় সিলা চমকিয়া উঠিল।

"কি সিলা? আজকাল আমায় দেখেও যে চমকাও দেখছি?

সিলা ঠাট্টা করিয়া বলিল, "যে ভীষণ তোমার চেহারা!"

"তুমি না বলেছিলে আমায় বিয়ে করবে? কেমন, বলনি?"

"হঠাৎ সে কথা কেন? সে তো ঢের কালের কথা।"

"আমি আর একবার কথাটা শুনতে চাই, আর একবার শোনবার দরকার হয়েছে, তাই বলছি। পতর মেরে কাঠ জুড়তে হলে দুদিক থেকেই পরখ করে দেখা দরকার যে, সে পতর টেঁকসই কি না···কোথাও ফাটা চটা আছে কি না। কলের কাজে ঢুকে পর্যন্ত তোমার মাথা নানান্‌ দিকে ঘোরে কি না, তাই বলছি।"

"বাস্‌রে বাস্‌, আমার জন্যে তুমি আজকাল যে বেজায় ভাবতে শুরু করেছ দেখছি। কিন্তু দেখ, সত্যি কথা বলতে কি, আমি এখন নিজেও একটু একটু ভাবতে শিখেছি,—বড় হইছি কি না। নিজের ভাল-মন্দ একটু একটু বুঝতে শিখেছি। তুমি ঠাউরে রেখেছ চিরদিন আমি সেই খুকীটি আছি। কি আশ্চর্য! দেখ, এখন আমি চললুম, আমার আজ ঢের কাজ। বাড়ীতে গিয়ে ছুটো খেয়েই আবার কারখানার বাগানে এসে কপি-কড়াইশুটির ক্ষেতগুলো সাফ করে ফেলতে হবে। ক্রিস্টোফা আসবে, জোসেফা আসবে, আরো তিন-চারজন আসবে। এ ফসলের আমরা ভাগ পাব, তা জানো?"

নিকোলা এতক্ষণ মনে মনে হিসাব করিতেছিল; মায়ের জন্য যাহা খরচ করিয়া ফেলিয়াছে, তাহা বাদে এখন তাহার হাতে আছে মোট সাতাশ ডলার। অন্ততঃ এর তিনগুণ না জমিলে ঘর বসতের জিনিসপত্র কিনিতেও কুলাইবে না। সিলাকে এই রকম কুসঙ্গে আর এক মুহূর্তও থাকিতে দেওয়া নয়; এজন্য সে দিনরাত খাটিতেও প্রস্তুত।

প্রকাশ্যে সে বলিল, "দেখ সিলা, দুজনেই যদি এখন থেকে একটু চারদিক সম্‌ঝে চলি, তা হলে, চাই কি বছর খানেকের মধ্যেই আমরা নিজস্ব ঘরকন্না পেতে, পায়ের উপর পা দিয়ে, অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়ে বসতে পারি। তবে, জোর করে কিছুই বলতে পারিনে; মনে করি এক, হয় আর।" এই বলিয়া নিকোলা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

সিলা হাসিতে হাসিতে বলিল, "আমি কি ভাবছি তা' জান? বিয়ে না হলে তোমার বুদ্ধিও খুলবে না, বলও বাড়বে না, ফুরতিও ফিরবে না। এখন তুমি এমনি হয়েছ যে, যেদিন তোমার সঙ্গে কথা কই সেইদিন সমস্ত দিনরাত মনটা কেমন যেন দমে থাকে। খুব ভালবাসার মানুষ যা হোক!"

সিলা কতকটা ছলভরে জুতার গোড়ালির উপর ভর দিয়া এক পাক ঘুরিয়া হাসিতে হাসিতে দ্রুতপদে দূরে চলিয়া গেল।

নিকোলা বার্বারার আগমনের কথা সিলাকে জানাইবার জন্যই আজ আসিয়াছিল; কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি, সিলাকে কাছে পাইয়া সে-কথা একদম তাহার মনেই ছিল না। যাক্‌, এবার যেদিন দেখা হইবে, ও খবরটা সেই দিন দিলেই চলিবে। সে দিনেরও বড় বিলম্ব নাই। আকাশ ক্রমশঃ পরিষ্কার হইয়া আসিতেছে।

* * * *

মাসখানেক পরে একজন পাড়াগেঁয়ে গাড়োয়ান একটা প্রকাণ্ড পেঁটরা নিকোলার দরজায় আনিয়া হাজির করিল। পেঁটরাটি বার্বারার। গাড়োয়ানের মুখে নিকোলা শুনিল, দুই-চারি দিনের মধ্যে স্বয়ং বার্বারাও আসিতেছেন।

মাতাঠাকুরাণীর মতলব নিকোলা ঠিক ঠাওরাইতে পারিল না। আবার চাকরির চেষ্টা? ভগবান জানেন।

ইহার পর একদিন সন্ধ্যাবেলা নিকোলা দোকান হইতে ফিরিয়া দেখিল, উহার ঘরের ভিতর এক কাঠের বাক্স আর ঠিক তার পাশেই এক জোড়া ফিতাওয়ালা জেনানা বুট। মাতাঠাকুরাণী তবে আসিয়াছেন।

প্রায় আধ ঘণ্টা পরে মাখন, পনির, রুটি প্রভৃতি সওদা করিয়া বার্বারা সশরীরে উপস্থিত হইল। উহার মোটঘাট এবং মোটা দেহে নিকোলার স্বল্পায়তন ঘরটি একেবারে ভরাট হইয়া গেল। স্থূলতাবশতঃ বার্বারা এখন অল্পেই হাঁপায়, উহার অস্থিময় চিবুকের নীচে এখন আবার আর একটা মাংসময় চিবুক গজাইয়াছে।

যৌবনে যে মুখ গোলাপ ফুলের মতো সুন্দর মনে হইত, এখন তাহা একটা প্রকাণ্ড চর্বণের যন্ত্র মাত্র।

নিকোলা বিছানার উপর বসিয়াছিল; বার্বারা সিন্দুকের উপর বসিয়া খাইতে খাইতে অনর্গল বকিয়া যাইতেছিল। তাহার বক্তব্য মোটের উপর এই :—

বার্ষিক আঠারো ডলার বন্দোবস্তে যে চাষীর ঘরে বার্বারা চাকরি লইয়াছিল, সে এমনি কৃপণ যে, নিজেও পেটে খায় না, লোকজনদেরও পেট ভরিয়া খাইতে দেয় না। কাজেই বার্বারাকে গাঁটের পয়সা খরচ করিয়া এটা ওটা কিনিয়া খাইতে হইত। কৌসুলী সাহেবের বাড়ী চাকরি করা অবধি এমনি অভ্যাস হইয়া গিয়াছে যে, মন্দ জিনিস মুখে তুলিতে গেলে চোখে জল আসে। বড়লোকের ছেলে কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করিয়া শেষে কিনা বার্বারার এই দুর্দশা! লাড্‌ভিগ-লিজির দুধমার ভাগ্যে কিনা এই বকৃশিশ! শহরে বড় বড় ঘরে সুখ্যাতি লাভ করিয়া শেষে কিনা ধান ভানিয়া দিন কাটানো!

বার্বারা প্রথম প্রথম ভাবিয়াছিল, কৌসুলী সাহেব আবার ডাকিবেন। বার্বারারই ভুল। বড়লোককে মনে করাইয়া দিতে হয়, নহিলে নিজে হইতে তাহারা বড় একটা কিছুই করে না। আর নিকোলা বাঁচিয়া থাক;—শহরে

বার্বারার এখন আর সহায়ের ভাবনা নাই। বার্বারা শহরে একখানি ছোটখাটো দোকান করিবার মতলব করিয়াছে। কৌঁসুলী সাহেবকে এ কথা সে আজ নিবেদন করিয়া আসিয়াছে।

গোড়াতে কৌঁসুলী সাহেব বার্বারাকে দেখিয়া বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন, ভাল করিয়া কথার জবাব পর্যন্ত দেন নাই। কিন্তু তাহাতে কি? বার্বারা উঁহার মেজাজ বুঝে, সে নানা রকম মন-জোগানো কথা কহিয়া তাঁহাকে ঠাণ্ডা করিয়া ফেলিতে জানে।

"লাড্‌ভিগ দাদাবাবু কেমন আছেন? লিজি দিদিবাবু কেমন আছেন?—জিজ্ঞেস করতে পারি কি? এতদিনে না জানি তাঁরা কত বড়সড় হয়েছেন; কেমন মোটাসোটা হয়েছেন। এখন বোধ হয় আর আমাকে দেখলে চিনতে পারবে না। না পারবারই তো কথা। কত দিন দেখাশুনো নেই।"

"হ্যাঁ বড়সড় হয়েছে, কিন্তু মোটাসোটা হয়নি। নৌকোর লগির মতন পাতলা—ছিপছিপে। তুই বোধ হয় এখনো দু'হাতে দু'জনের কোমর ধরে তুলতে পারিস্। আচ্ছা বার্বারা, তুই কি খেয়ে এত মোটা হলি বল্ দেখি? যে চাষার কাছে ছিলি তার মরাইটা শুদ্ধ গিলে ফেলেছিস্ নাকি? তার বোধ হয় ক্ষেতখামার সব গেছে?"

"আজ্ঞে, হুজুর! কৌঁসুলী সাহেবের বাড়ী থাকতে তো আর জাবনা খাওয়া অভ্যাস করিনি, যে চাষার খোরাকীতে মোটা হব! আর চাষাই কি কম লোক? সে খুব চালাক, নিজের গণ্ডা খুব বোঝে; আমি আবার তার ক্ষেতখামার খাব! কষ্ট পেতে আমিই পেয়েছি। অর্ধেক দিন গাঁটের পয়সা খরচ করে খেতে হয়েছে।"

ইহার পর লাড্‌ভিগ-লিজির স্নেহের কথা তুলিয়া বার্বারা কান্না জুড়িয়া দিয়াছিল। এই সময়ে কৌঁসুলী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোর সেই লক্ষ্মীছাড়া ছেলেটা?—সেটা কোথায়?"

"কে? নিকোলা? সে এখন এই শহরেই আছে। সে এখন মিস্ত্রির কাজে পাকা হয়ে উঠেছে।"

বলার পর বার্বারা দোকান করিবার মতলবটাও কৌঁসুলী সাহেবের কাছে খুলিয়া বলে। কৌঁসুলী সাহেব উহার কথায় খুশী হইয়া বাজার-পাড়ায় বিনা ভাড়ায় এক বৎসরের জন্ত তাহাকে দুইটা ঘর দিতে রাজী হইয়াছেন।

নিকোলা ও বার্বারা সামনাসামনি বসিয়া আছে। দুজনের মধ্যে চেহারার

সাদৃশ্য সুস্পষ্ট। তফাতের মধ্যে, অদৃষ্ট একজনকে কর্মে ব্যাপৃত রাখিয়া দৃঢ়সম্বদ্ধ করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছে, আর একজনকে অগাধ আলস্যের আরকে ডুবাইয়া মেরুদণ্ডহীন মাংসপিণ্ডে পরিণত করিয়াছে।

বার্বারা কেমন করিয়া ব্যবসা জমাইবে, নিকোলাকে তাহা বিস্তারিত বলিল। ভীর্গ্যাংদের দৌলতে শহরের যত বড় ঘরে তাহার যাতায়াত। সকলকে সে খরিদদার পাকড়াইবে। একবার জমিয়া গেলে, তখন আর ভাবিতে হইবে না। বাজারে একবার সুনাম হইলে অনেক মাল ধারেও পাওয়া যাইবে। তখন বকেয়া চুকাও, আর মাল বেচ আর মুনাফা কর; নগদ টাকা বাহির করিয়া মাল খরিদের আর কোনো হাঙ্গামাই থাকিবে না।

সম্প্রতি কিছু নগদ টাকার দরকার। বার্বারার যাহা আছে তাহাতে কুলাইবে না। এখন এক নিকোলাই ভরসা, সে যদি কিছু দেয়! টাকা নগদে থাকাও যা, আর পাঁচটা মালে থাকাও তাই। উহাতে নিকোলার লোকসানের কোনো ভয়ই নাই! পাই পয়সাটি পর্যন্ত ঠিক সমান—পুরা থাকিবে। এখন আছে পকেটে, তখন থাকিবে প্যাকেটে,—তফাতের মধ্যে এই।

"আচ্ছা, সস্তায় একখানা টেবিল কোথায় পাওয়া যায় বল দেখি? আর খানকয়েক চেয়ার? দোকান করতে হলে এগুলো তো আগে কেনা দরকার। নাঃ, ও সব ধারেও পাওয়া যেতে পারে। এখন কিছু নগদ হাতে না হলে দোকান খুলি কি করে বল দেখি? নগদেরি দরকার আগে। দোকানটা জমলে, তুমিও আমার কাছে এসে থাকবে; কি বল, নিকোলা। এখন তোমায় হোটেলে খাবার নিয়ে খেতে হয়, তাতে ঢের বেশি পড়ে যায়; আমি রাঁধব-বাড়ব, তাতে অনেক পয়সা বেঁচে যাবে। সে-কথাও ভেবে দেখ।"

বার্বারার বাক্যে সুবর্ণ বর্ষিতেছিল। নিকোলা কিন্তু কোনো মতেই মায়ের সঙ্গে সুর মিলাইতে পারিতেছিল না। সে মনে মনে খুবই ইতস্ততঃ করিতেছিল এবং ঘন ঘন পা দুলাইতেছিল। দোকানের ভবিষ্যৎ হয়তো খুবই আশাজনক। আর সে বিষয় হয়তো বার্বারা নিকোলার অপেক্ষা অনেক বেশি বোঝে,—তাহার উপর সে কৌসুলী সাহেবের কাছেও এ সম্বন্ধে অনেকটা আশা-ভরসা পাইয়াছে। কিন্তু বার্বারা যে হঠাৎ আজ নিকোলার সর্বস্বের উপর দাবি করিতে আসিয়াছে, এ দাবি কি ন্যায্য? যাহাকে সে স্তন্যে এবং স্নেহে বঞ্চিত করিয়াছে তাহার কাছে সে কি এতটা আশা করিতে পারে? নিকোলার মন বলিল, উহার চেয়ে এখন আর একজনের দাবি অনেক বেশি;

সে সিলা। বার্বারার কথায় পুরাপুরি রাজী হওয়া নিকোলার পক্ষে এখন অসম্ভব।

বার্বারা বকিয়াই চলিয়াছে। সে যে দেওয়ালে ঠেস্ দিতে গিয়া গজালে ধাক্কা পাইয়াছে—সে-কথা সে এতক্ষণেও বুঝিতে পারে নাই।

নিকোলা অনেকক্ষণ মাটির দিকে চাহিয়া মাথা হেঁট করিয়া বসিয়াছিল। শেষে মুখ না তুলিয়াই বলিতে আরম্ভ করিল, "তা দেখ মা, আমার টাকা তোমায় দেব এ আর বেশি কথা কি? তবে, ওটা কিন্তু আমার বছরের শেষে ফিরে পাওয়া চাই। তার কারণ, ঐ সময়ে আমি বিয়ে করব বলে স্থির করেছি। ঐ যে হল্‌ম্যান্‌-ছুতার,—তার মেয়ে সিলা,—তারি সঙ্গে বিয়ে;—আমি কথা দিয়েছি। হল্‌ম্যান্ মরবার পরেই এ বিষয়ে আমাদের সব ঠিকঠাক হয়ে আছে। এর আর নড়চড় হবে না। আর ঐ জন্যেই খেটে খুটে কিছু পয়সা হাতে করেছি; এখন এ সমস্ত ভেস্তে দিলে আমার উপর অন্যায় করা হবে।"

নিকোলা তীক্ষ্ণ চক্ষে একবার মাতার দিকে চাহিল। বার্বারা বুঝিল যে, এই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছেলেটির মন এখন একেবারেই তাহার হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে। এমনটা যে ঘটিতে পারে সে-কথা মোটে তাহার খেয়ালেই আসে নাই।

বেচারা নিকোলা মুখে যাহাই বলুক, মায়ের মনস্তুষ্টির জন্য বিদায়ের ঠিক পূর্বে তাহার কষ্টসঞ্চিত ডলারগুলি বার্বারার হাতেই সমর্পণ করিল।

শহরের গলিঘুঁজিতে এক শ্রেণীর দোকান আছে,—যাহারা ঠিক পাইকারও নয় অথচ ঠিক ছুটা দোকানদারও নয়। উহারা মহাজনের দেনা হপ্তায় হপ্তায় না মিটাইয়া মাসে মাসে মিটায়; এবং নিজের পাওনাগণ্ডা খরিদদারের কাছে হাতে হাতে আদায় না করিয়া সপ্তাহান্তে 'বিলে' আদায় করে। বার্বারা হইল এই শ্রেণীর দোকানী। সে মার্কিন মুলুকের লোকেদের মতো রাতারাতি দোকানদার হইয়া উঠিল। এক সপ্তাহের মধ্যে বার্বারা দোকান সাজাইয়া ফেলিল। পেঁজা তুলা, টোনের সূতা; রঙিন ফিতা, চুরুটের পাইপ; ছুরি কলম, দেশলাই, নস্য; পাউরুটি, লজেঞ্জেস্ প্রভৃতি নানা রকম জিনিসে ঘর ভরিল। মোমজামায় ঢাকা একটা প্রকাণ্ড কেরোসিনের বাক্স হইল টেবিল; আর একটা ছোটো বাক্স হইল চেয়ার। টাকাকড়ি যাহা অবশিষ্ট ছিল, তাহা প্রায় সিন্দুকেই থাকিত. খুচরা থাকিত একটা ডালাওয়ালা ফুটা চুরুটের বাক্সে।

দোকান খুলিবার ঝঞ্ঝাটের মধ্যেই বার্বারা শ্রীমতী হল্‌ম্যানের সঙ্গে পুরানো পরিচয় ঝালাইয়া লইল; কিন্তু সিলা সম্বন্ধে কোনো উচ্চবাচ্য করিল না।

হল্‌ম্যান্‌-গৃহিণীর বর্তমান বাসা বার্বারার দোকান হইতে বেশি দূর নয়। একদিন সে রাস্তা দিয়া যাইতে যাইতে নূতন দোকানের সাম্‌নে বার্বারাকে দেখিয়া দাঁড়াইল। বার্বারাও ছাড়িবার পাত্র নয়; চা তৈয়ারী করিল; পুরানো বন্ধুকে নূতন দোকানে চা না খাওয়াইয়া সে কিছুতেই অম্‌নি অম্‌নি যাইতে দিবে না।

দোকানে ঢুকিয়া হল্‌ম্যান্‌-গৃহিণী নাক সিঁটকাইল, দোকানের সাজসরঞ্জাম সম্বন্ধে তাহার অনেক বক্তব্য ছিল, কিন্তু চাপিয়া গেল। চা খাইতে খাইতে সে নিজের দুঃখকাহিনী জুড়িয়া দিল। হল্‌ম্যানের মৃত্যুর পর হইতে সে যে স্ত্রীলোক হইয়া কেমন করিয়া সংসার মাথায় করিয়া রাখিয়াছে তাহারই বিস্তারিত বর্ণনা।

"ও কি! এরি মধ্যে পেয়ালা সরিয়ে রাখছ যে? আর এক পেয়ালা নাও!"

এক পেয়ালা, দুই পেয়ালা, তিন পেয়ালা চা উড়িয়া গেল, হল্‌ম্যান্‌-গৃহিণীর কিন্তু নাকিসুর ঘুচিল না, স্ফূর্তির লক্ষণও দেখা গেল না। সে যতক্ষণ চা খাইতেছিল এবং ওজন করিয়া কথা কহিতেছিল, ততক্ষণ তাহার মাছের মতো নিষ্প্রভ চক্ষু দুইটা বার্বারার আসবাবপত্রের উপর ঘুরিতেছিল। শেষে, ভবিষ্যতে সে স্বয়ং বার্বারার দোকান হইতেই জিনিসপত্র খরিদ করিবে, এইরূপ একটা আশ্বাস দিয়া হল্‌ম্যান্‌-গৃহিণী গম্ভীর চালে চলিয়া গেল।

* * * *

কি একটা জিনিসের প্রয়োজনে সিলা বার্বারার দোকানে ঢুকিয়াছে, এমন সময় লাড্‌ভিগ আসিয়া দাঁড়াইল। বার্বারা ভারি খুশী; তবে তো লাড্‌ভিগ দুধমাকে ভোলে নাই! বড়লোকের ছেলে বলিয়া উহার তো কোনো দেমাক নাই, তা থাকিলে কি এই দরিদ্রপল্লীর ক্ষুদ্র দোকানের অপরিচ্ছন্ন পথ সে মাড়াইত?

লাড্‌ভিগ কিন্তু আসিয়াই সিলার সঙ্গে হাসি-তামাশা শুরু করিয়া দিল। সিলা তাহার দরকারী জিনিসটা বার্বারার হাত হইতে একরকম টানিয়া লইয়া তাড়াতাড়ি দোকান হইতে বাহির হইয়া গেল।

ভদ্রলোকের ছেলে লাড্‌ভিগের প্রতি সিলার এই অদ্ভুত ব্যবহারের কথা

সেই রাত্রেই নিকোলার কানে পৌঁছিল। বার্বারা বলিল, "লাড্‌ভিগ এমন কিছুই বলেনি যাতে অমন করে কানে আঙুল দিয়ে পালাতে হয়। মেয়ে যেন সরমের ডালি! ছুটে পালানো হ'ল। ভদ্র ঘরের মেয়ে অমন অবস্থায়-মাথা হেঁট করে থাকে; জবাব না দিলেই হ'ল। পালাবার কি দরকার? ও সব ঢং কি আর আমরা বুঝিনি? ও একরকম বাচ্‌ খেলানো, পুরুষমানুষ-গুলোকে নিয়ে মাছের মতন খেলিয়ে বেড়ানো আর কি! আর তাও বলি, ঐ খাটো জামা-পরা ডিগ্‌ডিগে, ভাজা চিংড়ির মতো কোল-কুঁজো মেয়েটা—ও কি নিকোলার মতন ছেলের যুগ্যি? না আছে শিক্ষা, না জানে সহবৎ। লাড্‌ভিগ না হয়ে যদি আর কেউ হ'ত তো আমি নিজে তাকে মেয়েটার পিছনে লেলিয়ে দিতুম।—ভাল কথা, নিকোলা, আজ যখন লাড্‌ভিগ দোকানে এল, তখন একবার ভাবলুম যে, যে পনেরো ডলারের কথা তোমায় সে-দিন বলেছিলুম, সেটা ওর কাছে চেয়ে দেখি, শেষে সিলার কাণ্ড দেখে সব গুলিয়ে গেল। যখন মনে পড়ল তখন লাড্‌ভিগ্‌ বেরিয়ে চলে গেছে।"

"ওর কাছে? না-না মা! সে হবে না; তুমি দু'দিন সবুর কর, আমিই যোগাড় করে দিচ্ছি; আমি যতক্ষণ পারি ওর কাছে চেয়ো না। দরকার কি?"

'এমন নইলে পেটের ছেলে!' বার্বারার পান্‌সে চোখে জল আসিল; বলিল, "দেখ নিকোলা, কিছু ভাল চা আর কেক তোমার জন্য রেখেছি; আজ প্যাকেট খুলেছিলুম, বিক্রি হয়ে কিছুটা পড়ে আছে, সেইটে তোমার জন্য রেখেছি।"

"না, মা, চা তো আমার রয়েছে; আর কি হবে? বিক্রির জিনিস বিলিয়ে দিতে নেই।" বলিতে বলিতে নিকোলা বাহির হইয়া গেল।

খানিক পরে রাস্তায় সিলার সঙ্গে সাক্ষাৎ। সিলার আজ হাসি ধরে না।

"পালিয়ে এলুম; ওর দিকে একবার তাকিয়েও দেখিনি। তুমি কি বল? ওর কাছে খানিক দাঁড়ানো উচিত ছিল, না? অন্ততঃ ভদ্রতার খাতিরে, না?" এই বলিয়া সিলা আবার হাসিতে লাগিল।

নিকোলার গাম্ভীর্য উড়িয়া গেল, সে হাসিয়া ফেলিল।

ফিরিবার সময় লাড্‌ভিগের সঙ্গে নিকোলার চোখোচোখি হইল। নিকোলার মন এবং সর্বশরীর কঠিন হইয়া উঠিল। সে আত্মসংবরণ করিয়া কোনো মতে পাশ কাটাইয়া চলিয়া আসিল।

আজ সিলার স্ফূর্তি নিকোলার চোখে ভাল লাগিয়াও যেন ভাল লাগে নাই।

আজকাল যখনি সে দেখা করিতে যায়, তখনি সিলার মুখে লাড্‌ভিগের কথাই শোনে। লাডভিগ কি বলিল, লাড্‌ভিগ কি পোশাক পরিল, ক্রমাগত এই সমস্ত কথা। উহাদের বাগান সাফ করা আর ফুরায় না।

রাত পর্যন্ত ক্রিস্টোফা-জোসেফার মতো হতভাগা মেয়েদের সঙ্গে বাগান সাফ! তবে, ভালর মধ্যে এই যে এসব খবর এখনো পর্যন্ত সে স্বয়ং সিলার মুখেই পাইতেছে। এখনো আশা আছে, এখনো উদ্ধারের উপায় আছে। আজকাল কারখানায় কাজ করিতে মনের ভিতর এই প্রসঙ্গ উঠিলে নিকোলা কেমন এক রকম হইয়া যায়। উহার মনে হয় কে যেন একটা প্রকাণ্ড ইস্ক্রুপ প্যাঁচ কসিয়া উহাদের দুজনকে কৌশলে তফাৎ করিয়া ফেলিতেছে।

গরীবের উপর এ কী জুলুম? আপনার বলিতে তাহার আছে তো অতি অল্পই,—সেটুকুও সে নিশ্চিন্তমনে ভোগ করিতে পাইবে না? নিজের আয়ত্তের মধ্যে আনিতে পাইবে না? সিলার সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য,—তাহাকে ধর্মপত্নী করিবার জন্য, নিকোলা প্রাণপাত পরিশ্রম করিতেছে; গৃহস্থালীর ভিত্তি পত্তন করিতে সে বিন্দু বিন্দু করিয়া শরীরের সমস্ত রক্ত দান করিতে প্রস্তুত। আর,—আর একজন, যাহার টাকার অভাব নাই, বিবাহের ইচ্ছা থাকিলে যে-কোনো ভদ্রঘরের সুন্দরী মেয়েকে পাইতে পারে সে—পশু, পশু! পশুর অধম, নরহন্তা—সুখের হন্তারক!

এইরূপ দুশ্চিন্তায় নিকোলার দিন কাটিতে লাগিল।

আজকাল সে বর্ষার অন্ধকারকে বন্ধু বলিয়া বরণ করিয়াছে। বর্ষার কল্যাণে তাহার সিলার সন্ধানে শহর প্রদক্ষিণ বন্ধ হইয়াছে; ইহার পর শীত পড়িবে, বরফ পড়া শুরু হইবে; ব্যস্! নিশ্চিন্ত।

* * * *

নিকোলা একদিন হিসাব করিয়া দেখিল, নাগাদ নূতন খাতা, তাহার হাতে প্রায় পঁচাত্তর ডলার জমিবে। ইহার মধ্যে পঁয়তাল্লিশ, আর তের—মোট আটান্ন ডলার উহার মায়ের হাতে। শেষবারে টাকা লইবার সময় বার্বারা বলিয়াছে, "কোনো ভয় নেই, দোকানে খুব বিক্রী, বেশ দু'পয়সা আসছে।"

ইহার মধ্যে নিকোলা একদিন ঘর ঠিক করিতে বাহির হইয়াছিল। এক রকম ঠিক করিয়াই আসিয়াছে। ঘরের সঙ্গে আলাদা রান্নাঘরও পাওয়া যাইবে। ভাড়াও বেশি নয়। সব ঠিক। এইবার একদিন হল্‌ম্যান্‌-গৃহিণীর

কাছে কথাটা পাড়িতে হইবে। নগদ পঁচাত্তর ডলার, হীগ্ বার্গের সার্টিফিকেট, তাহার উপর বাঁধা রোজগার,—হল্ম্যান্-গৃহিণী ভিজিবেই ভিজিবে।

বড়দিন ও ছোটদিনের মাঝখানের সপ্তাহে, একদিন নিকোলা মাকে গিয়া বলিল, "ফেব্রুয়ারি মাসে আমার টাকাটা পেলে তবে হল্ম্যান্-গিন্নীর কাছে কথাটা পাড়ব, মনে করেছি।"

বার্বারা চা তৈয়ার করিতেছিল, হঠাৎ উহার মাথাটা কেমন গোলমাল হইয়া গেল। সে বলিল, "তাই তো, তাই তো, আজ হিসেব নিকেশ করতে করতে প্রায় ক্ষেপে যাবার মতো অবস্থা হয়েছে। যাক, চা তৈরী হয়েছে, কেক আছে—তোমার জন্যে রেখেছি, ওগুলো আগে খাও; তারপরে ওসব কথা হবে। বড়দিন—বছরকার দিন, এ তো আর বছরে দু'বার হবে না। আজকের দিন যার যেমন সাধ্য—ভাল-মন্দ খেতে হয়। যে সংসারে মানুষ হয়েছি, সেখানে এ রীতির কখ্খনো নড়চড় হতে দেখিনি। তাই তো নিকোলা! এরি মধ্যে তুমি টাকা ফেরত চাইছ! এই বড়দিনের আগেই আমাকে চিনির মহাজনের দেনা শোধ করতে হয়েছে, আমি ভেবেছিলুম ও দেনাটা জুন মাস নাগাদ দিতে হবে, কিন্তু যখন তাগিদ এসে পড়ল তখন শোধ না করে আর পেরে উঠলুম না।—তা তোমার কোনো ভয় নেই; বল না কেন, এখনি টুপি মাথায় দিয়ে বেরিয়ে পড়লে টাকার যোগাড় করে আসতে পারি। এমন কি এক বাড়ী ছেড়ে দ্বিতীয় বাড়ীতেও পা দিতে হবে না।—খাও, নিকোলা, খাও; বড় দিন বছরকার দিন। টাকার কথা ভাবছ? কোনো ভাবনা নেই। তোমার মা যখন বলেছে, তখন তোমার মোটেই ভাববার দরকার নেই। লাড্ভিগ ভারি ভাল ছেলে। আর সেদিন আমায় দেখে টুপি খুলে যখন 'গুড্ মর্ণিং' করলে, তখন আমার যে কি আনন্দ হ'ল তা' আর বলতে পারি না। লাড্ভিগ বলে,—পয়সার অভাবে বার্বারা কষ্ট পাবে—এ আমি দেখতে পারব না। আমি যদি গিয়ে বলি আমার টাকার দরকার,—আমার ছেলের বিয়ে, তা হলে সে না দিয়ে থাকতে পারবে না। ও কি নিকোলা, অমন করে রইলে কেন? আমি তো বলছি,—টাকা তুমি ঠিক পাবে, ও কি! ও কি! অমন করে আমার দিকে কট্মটিয়ে তাকিয়ে রইলে যে?"

নিকোলা নিরুত্তর; সে অনেকক্ষণ একেবারে চুপচাপ বসিয়া রহিল। শেষে বিরক্ত হইয়া বার্বারা বলিয়া উঠিল—"ছোটদিনের পরেই দিয়ে দেব,

বাপু! এমন জানলে আমি মরে গেলেও তোমার কাছে টাকা চাইতে যেতাম না।"

"না, মা। এখন আমায় এটাকা দেবার দরকার নেই; যখন পার দিও। আমি তোমায় এজন্য আর পীড়াপীড়ি করতে চাই নে। কিন্তু যদি শুনি তুমি লাড্‌ভিগ ভীর্গ্যাণ্ডের কাছে টাকার জন্য হাত পেতেছ, তবে সেই দিন সেই মুহূর্তে আমাদের সম্বন্ধ পর্যন্ত চুকে যাবে। ইহজন্মের মতো চুকে যাবে। যাক, বিয়ের আয়োজন খুব এগিয়ে দিলে যা হোক! ভাল!"

নিকোলা দরজা খুলিয়া একেবারে রাস্তার বাহির হইয়া পড়িল।

নয়

নিকোলার টাকার তাগাদায় অসন্তুষ্ট হইয়া বার্বারা মনে মনে সিলাকেই অপরাধী সাব্যস্ত করিল। ঐ মেয়েটাই তো উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিয়াছে, নিকোলার মন ভাঙাইয়া লইয়াছে। নহিলে বার্বারার আজ ভাবনা কিসের? নিকোলার রোজগারের টাকা যদি বার্বারার হাতে পড়িত, তাহা হইলে আর বেচারাকে হিসাব নিকাশের এত ভাবনা ভাবিতে হইত না। তাহা ছাড়া, জিনিস ফুরাইয়া যাইতেছে অথচ পুঁজির টাকা ঠিকমতো ভ'জিতেছে না; ইহাতে সে আরো ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল।

অনেক পাড়াগেঁয়ে লোক পল্লীগ্রামের ধরনে খাইখরচটা একরকম হিসাবের মধ্যেই ধরে না। বার্বারাও এই দলের। নিজের সুবিপুল শরীর রক্ষার খাতে দোকানের যে সমস্ত জিনিস খরচ হইতেছে, তাহা সে ধর্তব্যের মধ্যে গণ্য করিত না, সুতরাং প্যাকেটগুলি তো খালি হইলই, অধিকন্তু পকেটও পুরিল না। ইহার উপর আবার সন্ধ্যাবেলায় চা-বিস্কুট বিতরণ ছিল। এটাকে সে কতকটা ব্যবসায়ের বিজ্ঞাপনের অঙ্গ বলিয়াই মনে করিত। একগুণ দিলে একশো গুণ আদায় হইবে, চায়ের মৌতাতে নূতন নূতন খরিদদার জুটিবে, এমনি তাহার আশা।

সুতরাং অল্পদিনের মধ্যেই বার্বারার দোকান-ঘর পাড়ার আধা-বয়সী মেয়েদের পরচর্চার আড্ডা হইয়া উঠিল।

* * * *

বরফ পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে। কন্‌কনে শীত। বেড়ার খুঁটির মাথায় মাথায় বরফের টুপি। ঝুরো বরফে পথঘাট সমাচ্ছন্ন!

বৈকালের দিকে, চা ধ্বংস করিতে এবং আগুন পোহাইতে একে একে অনেকগুলি প্রৌঢ়া বার্বারার দোকানে আসিয়া জমায়েত হইল।

জোঁকওয়ালী তারাল্‌সেন-গৃহিণী আজিকার সান্ধ্যসভায় প্রধান বক্তা। বর্তমানে সকল ব্যবসায়েরই যে অবনতি ঘটিতেছে, ইহাই তাহার প্রতিপাদ্য।

বিকেন-গৃহিণী, ওরফে ঢেঙা-গিন্নী কিন্তু উহার মতে ঠিক সায় দিতে পারিল না। সে বলিল, "আর দিদি, সেকালেই বা এমন কি ভাল ছিল?

আমিও তো আজকের লোক নই, সেকালের কথা আমার কাছে তো আর ছাপা নেই। এই দেখ না, এখনকার কালে কেরোসিন তেল সস্তা হয়ে গরীব লোকের কত সুবিধে হয়েছে, রাতকে দিন করে ফেলেছে। আগেকার কালে, লোকে আগুন পোহাবার সময়ে যেটুকু আলো পেত তাইতে একটু আধটু সুতো কাটত, রাত্রে অন্য কাজ করবার জো ছিল না। ছেলেগুলো তো বেলা তিনটে থেকে বিছানায় পড়ে পড়ে ক্রমাগত হাই তুলত আর এপাশ ওপাশ করত। এখন কেরোসিন হয়ে রাত আর দিন সমান হয়ে গেছে। লোকের রোজগারের রাস্তা বেড়ে গেছে।”

“হুঁ! বেড়েছে বই কি। সঙ্গে সঙ্গে জুয়াখেলা, মদ গেলা, রাত্তির বেড়ানোও বেড়েছে।”

“সে তো আর কেরোসিনের দোষ নয়, সে দোষ গ্যাসের। অবিশ্যি গ্যাসের অনেক গুণও আছে, গ্যাসের জোরেই তো কল চলছে, কত লোককে অন্ন দিচ্ছে।”

“হ্যাঁ, বদ্‌মায়েশীও শেখাচ্ছে।”

ঢেঙা-গিন্নী জবাব দিতে যাইতেছিল, হঠাৎ অ্যানি গ্রেভ্‌কে দোকানে ঢুকিতে দেখিয়া চুপ করিয়া গেল।

অ্যানি গ্রেভ্‌ পাদ্রী সাহেবের কাছে কর্ম করে, তাহার সাম্‌নে কাহারো বেফাঁস কথা কহিবার জো নাই।

ধন্যবাদ! ধন্যবাদ! অ্যানির চা খাইতে কোনো আপত্তি নাই। আজ আবার তাহার উপর অনেক খাটুনি হইয়াছে। শহরের একজন প্রসিদ্ধ বড়লোকের আজ কবর। শহরের যত বড়লোক আজ সমাধিস্থানে আসিয়াছিল।

“জীয়ন্তে, মানুষে মানুষ চিনতে পারে না, ম’লে পরে তার মর্যাদা বোঝা যায়। যে গরীবের হয়ে দু’কথা বলে, জীয়ন্তে তার ঢাক ঘাড়ে নেবার ঢের লোক জোটে, কিন্তু ম’লে”—এই বলিয়া ঢেঙা-গিন্নী চায়ের পেয়ালায় আবার চুমুক দিল। এই অবসরে তারালসেন-গৃহিণী অন্য কথা পাড়িয়া ঢেঙা-গিন্নীর কথা চাপা দিল। সে বলিল, “গরীবই বল আর বড়লোকই বল, আজকাল সকল ঘরের ছেলে-মেয়েই এক এক ধিঙ্গি। কাল সন্ধ্যাবেলা গুটি পাঁচ-ছয় জোঁকের যোগাড় করে ঘরে ফিরছি,—বাজারের কাছে ওষুধের দোকানের সাম্‌নে এসে ভাবলুম,—এতখানি যখন বাটপাড়ের হাত এড়িয়ে

আসা গেছে, তখন আর ভয় নেই, নির্বিঘ্নে বাড়ী পৌঁছাব। হঠাৎ কতকগুলো বুড়ো বুড়ো মেয়ে এসে পিছন থেকে এমনি জোরে চেঁচিয়ে উঠল যে, ভয়ে আমার হাত থেকে জোঁকের শিশিটা ছিট্‌কে পড়ে গেল। আমি তাই সামলে গেলুম, অন্য লোক হলে আঁতকে অজ্ঞান হয়ে যেত। ভাগ্যিস্‌ চাঁদের আলো ছিল, তাই সেগুলোকে আবার কুড়ুতে পারলুম। নইলে সব মেহনৎ মাটি হ'ত।...কে আবার? ঐ জোসেফা, ক্রিস্টোফা আর আমাদের হল্‌ম্যান্‌-গিন্নীর ধিঙ্গি মেয়ে সিলা। ওর মা ভাবে আমার মেয়ে বুঝি ভারি ভাল, অন্ধকারে তার যে আর এক মূর্তি হয়, সে খবর তো আর রাখে না!"

বার্বারা শেষের কথাগুলি মনের মধ্যে গাঁথিয়া রাখিল। সিলার সম্বন্ধে দশে কি বলে, নিকোলাকে তাহা শুনাইয়া দেওয়া চাইই চাই।

"জোঁকের কথা যা তুমি বললে, সেটাতে অবিশ্যি মেয়েদের একটু দোষ আছে; তা' আমি অস্বীকার করিনে! তবে কি জান, ছেলে মানুষ—এখন ওদের রক্ত গরম, এ বয়সে অমন একটু আধটু হয়েই থাকে। তা'ছাড়া ওরা যদি আমোদ না করবে তো করবে কে? বুড়োরা?"

ঢেঙা-গিন্নীর প্রতিবাদে জোঁকওয়ালী বেজায় চটিয়া উঠিল।

"গেরস্তর মেয়ের পক্ষে রাস্তায় মাতামাতি করে বেড়ানো—এও বুঝি একটা নতুন ফ্যাশান্‌! তা' হবে! আমরা বুড়ো হুড়ো মানুষ, নতুন ফ্যাশানের মর্ম বুঝিনে।...বলি, হাঁসের পালে মাঝে মাঝে যে শেয়াল ঢোকে, সে খবর কি রাখ?"

"বেশ, বেশ, তাই যদি হয়, তা হলে শেয়ালের উপরেই ঝাল ঝাড়া উচিত; হাঁসের উপর রাগ করে কি হবে? ওই যে ভাঙাই-ওলার ছোকরা বাবু, ওই যে ভেড়া-বাজারের বাজার-সরকার, ওই যে কৌঁসুলী সাহেবের ছেলে লাড্‌ভিগ—ওদের উপর ঝাল ঝাড়তে পার তবে বলি হাঁ।"

ঠিক এই সময়ে বার্বারা খরিদদারকে জিনিস দেখাইতেছিল, হঠাৎ লাড্‌ভিগের নাম শুনিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল।

"লাড্‌ভিগ? লাড্‌ভিগের সম্বন্ধে আমার সামনে কেউ কিছু বলতে পাবে না। অমন ছেলে আর আছে? আমি এক নাগাড়ে চৌদ্দ বছর তাকে হাতে করে মানুষ করেছি; ওর সম্বন্ধে আমি যা' জানি তার চেয়ে বেশি কেউ জানে না। লাড্‌ভিগ আমার কি 'ন্যাওটো'ই ছিল। সে সব কথা—"

খরিদদার সাবানের জন্য তাগিদ না দিলে বার্বারা আরও খানিক লাড্‌ভিগের

গুণ বর্ণনা করিতে পারিত। কিন্তু কি করিবে খরিদদার বেজার হইতেছে . অগত্যা বেচারা মুখ বন্ধ করিয়া সাবানের বাক্স খুলিতে গেল।

জোঁকওয়ালী আবার মেয়েদের লইয়া পড়িল। সন্ধ্যা হইলে কলের মেয়েগুলা আর্সোলার মতো দরজায় দরজায় মুখ বাড়াইতে থাকে, ইহা সে স্বচক্ষে দেখিয়াছে।

অ্যানি গ্রেভ্ উহার সঙ্গে যোগ দিয়া একধার হইতে সমালোচনা আরম্ভ করিয়া দিল। কোনো কোনো মেয়ের সম্বন্ধে উহারা স্পষ্ট নাম না করিয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া যাহা-না-বলিবার তাহাই বলিল। কাহারো সম্বন্ধে সন্দেহমাত্র প্রকাশ করিয়াই নিরস্ত হইল; আবার কাহারো কাহারো নামে নাম ধরিয়াই অসঙ্কোচে কুৎসার কালি লেপন করিতে লাগিল।

বার্বারা আগাগোড়া কান খাড়া করিয়া আছে। সিলার সম্বন্ধে ইহারা কি বলে সেই দিকেই উহার লক্ষ্য। কারণ, সে সমস্ত কথা নিকোলাকে জানাইতে হইবে। আগে থাকিতে সাবধান করিয়া দেওয়া চাই তো।

নিকোলার কাছে, অল্পবয়সী কলের মেয়েদের চরিত্র কীর্তন করিতে গিয়া বার্বারা কোনোদিন স্পষ্ট করিয়া সিলার নাম করে নাই; ততটুকু বুদ্ধি উহার ছিল। নিকোলা এমন না ঠাওরায় যে বার্বারা সিলার নামে উহার কাছে লাগাইতে আসিয়াছে। কিন্তু এই সমস্ত কথা যে ক্রমেই নিকোলার পক্ষে মর্মান্তিক হইয়া উঠিতেছে, ইহা বার্বারা বেশ বুঝিতে পারিত। ইহাই তো সে চায়।

ঢেঙা-গিন্নী, জোঁকওয়ালী প্রভৃতি চলিয়া গেলে, সেই রাত্রেই বার্বারা নিকোলাকে তাহাদের সমস্ত মন্তব্য বিবৃত করিয়া বলিল। নিকোলা মুখ ভার করিয়া রাস্তার দিকে চাহিয়া রহিল।

চাঁদের আলোয় দলে দলে কিশোরবয়স্ক ছেলেমেয়েরা আনন্দে হল্লা করিতে করিতে চলিয়াছে। মাঝে মাঝে শহরের ভদ্রলোকদেরও দর্শন পাওয়া যাইতেছে। একজন ছোকরা একটা ঠেলাগাড়ী ঠেলিয়া আনিতেছে—একগাড়ী মেয়ে।

নিকোলা মায়ের কথায় কোনো প্রতিবাদ না করিয়া উঠিয়া গিয়া জানালায় দাঁড়াইল; বার্বারা সেলাই করিতে লাগিল।

নিকোলা দেখিল জানালার নীচে ক্রিস্টোফা ও জোসেফা। নিশ্চয় কাহারো জন্য অপেক্ষা করিতেছে।—বোধ হয় সিলার জন্য। উহাদের উভয়ের

মধ্যে, কে যে হল্‌ম্যান্‌-গৃহিণীর কাছে সাহস করিয়া সিলাকে আজিকার মত ছুটি দিবার কথা পাড়িবে, এই লইয়া তর্ক চলিতেছিল।

এই সময়ে আর একটা দল উচ্চহাস্যে পথ মুখরিত করিয়া নিকোলার সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল।

বার্বারা সেলাই বন্ধ করিয়া বলিয়া উঠিল—"ইস্‌! কী কলরব! যতক্ষণ জোচ্ছনা ততক্ষণ আর নিস্তার নেই। এ সব ক্রমে হ'ল কি?"

নিকোলার সর্বাঙ্গ আগুন হইয়া উঠিল। সিলা যদি এই সমস্ত দলে মেশে, তবে সে আর ইহজন্মে হাতুড়ি ধরিবে না।

ঐ যে সিলা—গলির মোড়ে; বোধ হয় বন্ধুদের খুঁজিতেছে।

নিকোলা তাড়াতাড়ি দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া গেল।

"এই যে! সিলা নাকি?"

"এই যে! নিকোলা! ক্রিস্টোফাকে এদিকে দেখেছ? জোসেফাকে?—দেখনি? ভারি একটা কথা ছিল!...আচ্ছা, কেমন করে এলুম বল দেখি? আমাদের সেই বেরালটাকে ধরতে এসেছি। আমি সেটাকে তাড়িয়ে বার করেছিলুম। তারপর উঠানে চট্‌ করে একটা কাঠের টব চাপা দিয়ে রেখে এসেছি। মা তা' দেখতে পায়নি। এখন 'ম্যাও, ম্যাও' না করলে বাঁচি।"

সিলা সশঙ্কভাবে আর একবার চতুর্দিকে চাহিল।

"বারবার করে বললে,—আমার জন্যে অপেক্ষা করবেই অথচ—"

"অথচ, চলে গেল—সোজা।"

"না, না, বোধ হয় তারা এখনো আসেনি, এলে অপেক্ষা করতই। কিন্তু আমি আর বেশিক্ষণ বাইরে থাকলে এখনি মা এসে হাজির হবে। আমি চললুম।...নিক! তুমি যদি দাঁড়াও এইখানে, তারা এলে বোলো আজ আমি কোনো মতেই বেরুতে পারব না। কাল মা যাবে আণ্টনিদের কাপড় ইস্ত্রি করতে, রাত্রে ফিরবে না। আমিও দেব দৌড়। তুমি কিন্তু একটু এখানটা ঘুরে তাদের সঙ্গে দেখা করে, সব কথা ভাল করে বোলো; নইলে তারা আমায় ভারি দুষবে।"

"বেশ সিলা, বাঃ! তুমি এখন একেবারে স্বাধীন হতে চাও? তোমাকে ওরা নিজের দলে না টেনে ছাড়লে না দেখছি। কিন্তু যাদের ইজ্জতের ভয় আছে, তারা যে কেমন করে ওদের সঙ্গে মেশে এ আমি কিছুতেই বুঝতে পারিনে।"

"ইজ্জত? যাদের ইজ্জত আছে তারা বুঝি কেবল দোলাই মুড়ি দিয়ে ঠুঁটো কাঠের পুতুলের মতো ঠুক্‌ঠুক্‌ করে বেড়ায়? হাসেও না? কাঁদেও না? নাচেও না? দেখ, আড়ষ্ট হয়ে ভয়ে ভয়ে গণ্ডির ভিতর চিম্‌টের মতো পা ফেলে চলতে আমি কখ্‌খনো শিখব না, এতে তুমি যাই বল আর যাই কও। আড়ষ্ট হয়েই যদি জীবন কেটে গেল তবে বেঁচে সুখ কি? ম'লেই তো মঙ্গল।"

নিকোলা মাথা নাড়িয়া বলিল, "যা বলছ, সব ঠিক,—যদি রাস্তায় ওৎপাতা জানোয়ারের উৎপাত না থাকত। কি জান, তারাও শিকার চায়; কাজেই গরীব মানুষের নানাদিকে চোখ রাখতে হয়, সকল দিক বাঁচিয়ে চলতে হয়। দেখ সিলা, এ উদ্বেগ আর সহ্য হয় না। এখন তোমার যদি মত থাকে তো বল, আজ—এখনি তোমার মার কাছে গিয়ে বিয়ের প্রস্তাবটা করে ফেলি।"

আকস্মিক আতঙ্কে সিলা চীৎকার করিয়া উঠিল—"পাগল! তুমি ক্ষেপেছ! না, না, না; মাকে তুমি জান না? তুমি কি আগাগোড়া সকল কথাই ভুলে গেলে? ওকথা বলবার ঢের সময় আছে, আরো কিছু জমুক, তখন বোলো। ঢের সময় আছে।"

"ঢের সময় আছে? না সিলা. আমার মনে হচ্ছে, আর একটুও দেরী করা উচিত নয়। ও আমি জোর করে মন বেঁধে চট্‌পট্‌ বলে ফেলতে চাই।"

"তার পর? বাড়ীতে আমার কি দুর্দশা হবে তা' বল দেখি? আর এ পোশাকে এমন সময়ে তুমি মার কাছে কি করে যাবে? সে কিছুতেই হবে না।"

"ভয় কি, মিস্টার নিকোলা, ভয় কি? আমার সুবোধ মেয়ে অসহায় বিধবা মায়ের সুনাম কেমন করে রক্ষা করছেন, সেটা না হয় নিজের চোখেই দেখলুম তাতেই বা ক্ষতি কি?"

তাই ত! এ যে হল্‌ম্যান্‌-গৃহিণীর আওয়াজ! সে বিষয়ে আর তিলমাত্র সন্দেহ নাই। সে কখন যে নিঃশব্দে আসিয়া একেবারে জাহাজের মাস্তুলের মতো সোজা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা কেহই টের পায় নাই।

"যখন কর্তা মারা গেলেন, ভাবলুম এর চেয়ে বুঝি আর কষ্টের বিষয় কিছু নেই। আজ আমার সে ভুল ঘুচল। আমার মেয়ে!—সিলা—আমায় না বলে এই অন্ধকারে বাড়ীর বার হয়ে বরফের মাঝখানে বেটাছেলের সঙ্গে কথা!…সিলা! চলে এস বলছি, চলে এস; এখুনি চলে এস বলছি, এস!"

সিলা ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। ক্রোধে, ঘৃণায়, অবজ্ঞায়, তাচ্ছিল্যে, ক্ষোভে হল্‌ম্যান্‌-গৃহিণীর কণ্ঠস্বর বিকট হইয়া উঠিয়াছে।

নিকোলা কিন্তু এই চণ্ডীমূর্তিতে পূর্বের মতো আর ভয় পাইল না। সে বলিল—"দেখুন, আমি আপনার কাছেই যাচ্ছিলুম। এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে ঠিক ইচ্ছা ছিল না। আপনার সঙ্গে আমার কথা আছে। চলুন, আপনার বাড়ী গিয়েই সব বলব।"

"যা বলতে হয় তা এইখানেই বোধ হয় বলা যেতে পারে, এইখানে দাঁড়িয়েই বলা যেতে পারে।…সিলা, এস এই দিকে!"

"হ্যাঁ, এইখানেই বলা যেতে পারে, সমস্ত পরিষ্কার করে বলতে হবে সেই জন্যই বলছিলুম।"

হল্‌ম্যান্‌-গৃহিণী গলির মোড় জুড়িয়া দাঁড়াইয়া রহিল এবং বারংবার সিলার উপর তর্জন করিতে লাগিল। অনেকক্ষণ সহ্য করিয়া আতঙ্কের আতিশয্যে নৈরাশ্যের দুঃসাহসে সিলা অবশেষে একরূপ চোখ বুজিয়াই নিকোলার পার্শ্বে আসিয়া উহার হাতখানি দুই হাতে ধরিয়া পা দৃঢ় করিয়া দাঁড়াইল।

"হ্যাঁ, ম্যাডাম্‌, যা দেখছেন ঠিক এই। আমাদের ছেলেবেলা থেকে পরস্পরের প্রতি ঠিক এই ভাব। আজকে আপনার কাছে আমি এই কথাই জানতে যাচ্ছিলুম। আপনি এখন মত করলেই হয়। আমি পাকা মিস্ত্রি হয়েছি, ভাল ভাল সার্টিফিকেট পেয়েছি, তাছাড়া আমি কোনো নেশা করিনে; এ সমস্ত কথা মনে করে আপনাকে বিবেচনা করতে হবে—"

অবসন্ন সিলা আর দাঁড়াইতে পারিতেছিল না, সে নিকোলাকে ও শ্রীমতী হল্‌ম্যান্‌কে ঠেলিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে একেবারে সোজা বাড়ীর দিকে চলিল। পিছনে পিছনে হল্‌ম্যান্‌-গৃহিণী এবং নিকোলাও চলিল।

সিলা ঘরে ঢুকিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িল। নিকোলা বসিল না। সে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া গাম্ভীর্যের অবতার হল্‌ম্যান্‌-গৃহিণীর কাছে ভবিষ্যৎ জীবনের আশা-ভরসার কথা উৎসাহের সহিত বিবৃত করিতে লাগিল।

অনাথা বিধবার একমাত্র অবলম্বন সিলাকে কাড়িয়া লইয়া নিকোলা যে ভয়ঙ্কর অন্যায় কার্য করিতেছে, এই কথাটাই হল্‌ম্যান্‌-গৃহিণী খুব ঘোরালো করিয়া বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু কি ভাবিয়া থামিয়া গেল। সহসা উহার

চোখ খুলিয়া গেল। সে ভাবিল, নিকোলা যাহা বলিতেছে তাহা যদি সত্যই ঘটে, সে যদি বড় কারিগরই হয়, তবে তাহাকে জামাই করিয়া লইলে ভবিষ্যতের আর ভাবনা থাকে না। তাহা হইলে নিকোলার ঘরেই তো আশ্রয় পাওয়া যাইতে পারে।

এই কথাটা ফস্ করিয়া মাথায় আসায় ভিতরে ভিতরে মনটা নরম হইলেও, বাহিরে সে বড় একটা নরম ভাব দেখাইল না। ইহার পরেও সে রীতিমতো দরদস্তুর করিতে ছাড়িল না। সিলার বিবাহের সম্বন্ধে তাহার যে অনেক বড় আশা ছিল, এমন কথাও বলিল।

সে যাহাই হউক, ন্যূনপক্ষে অন্ততঃ একশত ডলার না দেখাইতে পারিলে নিকোলার যে কোনো আশা-ভরসাই নাই, এ কথা সে স্পষ্টই বলিয়া দিল। হল্‌ম্যানের বিবাহের পূর্বে হল্‌ম্যান্‌ও ঠিক অতগুলি ডলারের মালিক ছিল। তবেই না সে হল্‌ম্যানের গৃহিণী হইতে রাজী হয়। এ যতদিন যোগাড় না হয় ততদিন সিলার সঙ্গে দেখাশুনা বন্ধ।

একশত ডলার!—যাক্! নিকোলা অনেকটা নিশ্চিন্ত হইল।

বার্বারাকে সে এই সুখবরটা না দিয়া থাকিতে পারিল না। সিলাদের বাড়ী হইতে বিদায় লইয়া সে একেবারে বার্বারার দরজায় গিয়া হাজির হইল এবং কড়া নাড়িয়া তাহাকে জাগাইয়া সমস্ত কথা খুলিয়া বলিল।

বার্বারা কথাটা যে কি ভাবে লইল তাহা ঠিক বোঝা গেল না; সে নিজেও নিজের মন বুঝিতে পারিল বলিয়া মনে হয় না। অনেকক্ষণ বিছানায় এ-পাশ ও-পাশ করিয়া সে হঠাৎ লেপ ফেলিয়া উঠিয়া বসিল। তাই তো! এবার তো সে নিকোলার সংসারে 'গিন্নী বান্নি' হইয়া থাকিতে পারে। কি আশ্চর্য! একথাটা এতক্ষণ তাহার মাথায় প্রবেশ করে নাই!

কুক্ষণে সে দোকান করিতে গিয়াছিল। দোকানই এখন তাহাকে গ্রাস করিতে বসিয়াছে। হায়! বার্বারা যে নিজেই দোকানটা গ্রাস করিতেছে, একথাটা তাহাকে কেহ বুঝাইয়া দেয় নাই। এখন দোকানপাট তুলিয়া দিয়া সময় থাকিতে সে সাবধান হইবে। সিলা ছেলে মানুষ, সংসারের কিছুই জানে না। বার্বারা না থাকিলে কিছুতেই সে পাকা গৃহিণী হইতে পারিবে না। আর নিকোলার কথাও বলি, মাকে ভরণপোষণ করা তো সন্তানের কর্তব্যই।

পরবর্তী রবিবারে হল্‌ম্যান্-গৃহিণী অভ্যাসমতো বার্বারার দোকানে চা

খাইতে আসিল। বিবাহ সম্বন্ধে কিন্তু দুজনের মধ্যে কেহই কোনো উচ্চবাচ্য করিল না। অনেকক্ষণ পরে কথায় কথায় নিকোলার কথা উঠিলে বার্বারা বলিল, "ছেলেকে ছেড়ে অনেকদিন তফাৎ হয়ে রয়েছি। এবার ভেবেছি বোন, এই শীতটা বাদে মায়ে বেটায় ঐ সাম্‌নের ঘরটাতে উঠে গিয়ে নতুন সংসার গুছিয়ে নেব।"

হঠাৎ হল্‌ম্যান্‌-গৃহিণীর মুখ অন্ধকার হইয়া গেল, সে আর চা গিলিতে পারিল না। তাড়াতাড়ি শুধু শুষ্ক 'ধন্যবাদ' দিয়া উঠিয়া চলিয়া গেল। এই ঘটনার পর দুজনের মধ্যে ভিতরে ভিতরে বেশ একটু মন কষাকষি চলিল, বাহিরে অবশ্য তাহার কোনো লক্ষণ দেখা যাইত না। এমন কি ইহাতে হল্‌ম্যান্‌-গৃহিণীর চায়ের স্পৃহাটা একটুও কমিল না এবং যাতায়াতও বন্ধ হইল না, বরং বাড়িয়াই উঠিল। কেবল যে কথাটা উহাদের উভয়েরই ঠোঁটের আগায় সর্বদাই আসিয়া উপস্থিত হইত, সেই কথাটাই চাপা রহিয়া গেল।

নিকোলা ও সিলার ভাবী গৃহস্থালীতে শূন্য গৃহিণীর পদ লইয়া যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সূত্রপাত হইয়াছে, তাহাতে কে যে জয়ী হইবে তাহা বলা দুষ্কর। দু'জনেই পাকা খেলোয়াড়ের মতো 'বড়ের' চাল চালিতে লাগিল।

এক বিষয়ে উহাদের দুইজনেরই মতের ভারি ঐক্য ছিল। উহাদের উভয়েরই মনোগত কথাটা এই যে, "নিজে যদি এই সংসারের কর্ত্রী হইতে না পাই, তবে অন্ততঃ প্রতিপক্ষকেও কর্ত্রী হইতে দিব না।"

এমনি করিয়া দুই ভাবী বৈবাহিকা পরস্পরের উপর খড়্গহস্ত হইয়া উঠিতেছিলেন এবং পরস্পরের সমস্ত সঙ্কল্প পণ্ড করিবার পন্থা খুঁজিতেছিলেন। অথচ নিকোলা কিংবা সিলা এ ব্যাপারের বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারিতেছিল না।

দশ

মায়ের চোখে ধূলা দিয়া সিলা যে এতদিন পর্যন্ত নিকোলার সঙ্গে ভাব রাখিতে পারিয়াছে, ইহাতে হল্‌ম্যান্‌-গৃহিণী মনে মনে ভারি বিস্মিত হইয়া গেল। এখন হইতে সে সিলার গতিবিধির উপর কড়া নজর রাখিতে শুরু করিল। নিকোলার তো প্রবেশ নিষেধ।

সমর্থ মেয়ে নিষ্কর্মা থাকিলে যাহা হইবার তাহাই হইয়াছে। এখন হইতে সিলাকে দস্তুরমতো খাটাইতে হইবে; কাজে কর্মে থাকিলে বাহিরের কথা মনে থাকিবে না। শুধু দুধ আনা, মোজা সেলাই নয়,—কাজের মতো কাজ, হাড়ভাঙা খাটুনি।

নিকোলা দেখিল, সম্বন্ধ এক রকম স্থির হইয়া গেল বটে, কিন্তু দেখাশুনার ভারি অসুবিধা হইল। না হোক দেখা-সাক্ষাৎ,—সম্বন্ধ তো স্থির,—নিকোলা তাহাতেই খুশী। এখন পুরুষ বাচ্ছার মতো খাটিয়া খুটিয়া এক শত ডলার জমাইতে পারিলেই হয়। ভাবিতে ভাবিতে নিকোলার হাতে হাতুড়িটা যেন কলের বেগে চলিতে লাগিল।

হল্‌ম্যান্‌-গৃহিণীর অতি-সতর্কতায় নিকোলা সন্তুষ্ট হইতে না পারুক, কতকটা নিশ্চিন্ত যে হইয়াছিল তাহা নিঃসন্দেহ। ক্রিস্টোফা-জোসেফাদের কুসংসর্গ হইতে বেচারী সিলা এবারের মতো রক্ষা পাইল। সন্ধ্যাবেলার মাতামাতি একেবারে বন্ধ। কারখানা হইতে ফিরিবার সময় হঠাৎ একদিন বার্বারার দোকান হইতে লাড্‌ভিগকে বাহির হইতে দেখিয়া নিকোলা চমকিয়া উঠিল।

"এই সে! না?" বার্বারার দিকে ঘাড় ফিরাইয়া কথা কয়টা বলিয়াই,—যেন ঠিক নিকোলাকে চিনিতে পারিতেছে না,—এই ভাবে উহার দিকে অর্ধ-মুদিত চক্ষে চাহিতে চাহিতে, ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে লাড্‌ভিগ চলিয়া গেল।

"মা! ও এখানে কি করতে এসেছিল?"

"কই? কিছু না।"

"তুমি টাকা ধার চেয়েছ? ঠিক করে বল।"

"না গো না,—এক পয়সাও চাইনি। টাকার খুব দরকার, তবুও চাইনি।"

"ও বলছিল কি?"

"কি আবার বলবে, রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল, দোকান থেকে চুরুটটা ধরিয়ে নিয়ে গেল।...এতে বোধ হয় তোমার অপমান করা হয়নি! আর, ওকে ঢুকতে মানা করে কারো যে বেশি সম্মান বৃদ্ধি হবে তাও তো মনে হচ্ছে না।" বার্বারা মনে মনে ক্রমশঃ গরম হইয়া উঠিতেছিল।

"না মা, আমি ওকে ঢুকতে মানা করতে পারিনে। কিন্তু মনে রেখো যে, যদি শুনতে পাই তুমি ওর কাছে টাকা ধার করেছ, তা হলে আর মুখ দেখাদেখি থাকবে না।"

"পাগল! পাগল! এত অল্পে তুমি রেগে ওঠ, নিকোলা!...ওর কাছে কেন টাকা চাইব? তুমি যখন একবার মানা করে দিয়েছ তখন চাইবার দরকার?" বলিতে বলিতে হঠাৎ পিছন ফিরিয়া বার্বারা তাহার মুঠা হইতে কি একটা জিনিস বুকের কাপড়ে লুকাইয়া ফেলিল।

"ও আমার বিষয় কী বলছিল?"

"কই না!"

"বলছিল বই কি, মা!"

"তোমার কথা?...ও!...হ্যাঁ, হ্যাঁ; আমিই বলছিলুম যে, হল্‌ম্যান্‌-গিন্নীর কথামতো তুমি এখন উঠে পড়ে টাকা জমাতে শুরু করেছ আর আজকাল খুব খাটছ; তাইতে তোমার কথা উঠল।"

"সিলার কথাও হল?"

"উঁ—হুঁ। ও সে আগেই শুনেছে;—এ পাড়ায় তো আর গেজেটের অভাব নেই, সে-কথা ও আগেই শুনেছে।"

"তুমি বললেও ক্ষতি ছিল না। সিলা যে এখন বাগ্‌দত্তা হয়ে আছে, সে-কথা ওর জেনে থাকা উচিত।"

"আমিও তাই বলেছি,...ও কিন্তু কথাটা বিশ্বাস করল বলে বোধ হ'ল না।"

"তাই না কি? বটে!" নিকোলা ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া জানালার ধারে নিশ্চল ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। লাড্‌ভিগের এখন মতলবটা কি?

নিকোলার ভাবনার অন্ত ছিল না। এদিকে তো এই; ওদিকে আবার

যে কারখানায় এখন সে কাজ করে, সেখানে বাইস্‌ম্যানের কর্মখালি হইবার সম্ভাবনা হওয়ায় ভারি একটা গোলমাল চলিতেছিল। মনিব-গৃহিণী অনেকবার নিকোলাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন, কিন্তু কিছুই স্থির করিয়া বলেন নাই। কারণ, পুরানো বাইস্‌ম্যানের বিদায় লইতেও দেরী আছে, সে গ্রীষ্মের পর ভিন্ন যাইবে না। কারখানায় ইহারি মধ্যে গোলমাল উঠিয়াছে—"বল কি ? আমাদের ওলফ্‌ বাইস্‌ম্যান হবে না ?...আচ্ছা না হোক, ওকে ঠেলে যে বাইস্‌ম্যান হতে চায়, তাকে কিন্তু একলাই কারখানা চালাতে হবে, আমরা কেউ তার তাঁবেদার হয়ে থাকব না। ওলফের সঙ্গে সঙ্গে সব বেরিয়ে চলে যাব।"

এই রকমের কথা আজকাল নিকোলা প্রায়ই শুনিতে পায়। নিকোলার উপর সকলেই চটা,—নিকোলা মদ খায় না, কামাই করে না, কাজে ফাঁকি দেয় না, উহাদের দলে ভিড়ে না—ইহা কি কম অপরাধ !

নূতন কারখানায় নিকোলা একটিও সঙ্গী পায় নাই,—বন্ধু তো দূরের কথা। সুতরাং এত লোক থাকিতে হঠাৎ সে বাইস্‌ম্যান হইবার সম্ভাবনা হওয়ায় খুশী তো কেহ হইলই না, উপরন্তু উহার জীবনের পুরাতন কাহিনী লইয়া খুব একটা ঘোঁট চলিতে লাগিল। চোর অপবাদে কবে সে পুলিসের হাতে পড়িয়াছিল, সে কথাটা হইতে আরম্ভ করিয়া ছেলেবেলায় কবে সে বান্‌হাউসে তেরপল মুড়ি দিয়া পড়িয়া ছিল সে কথাটা পর্যন্ত,—কোনো কথাই উহাদের আলোচনা হইতে বাদ পড়িল না।

এই সমস্ত অপমান-সূচক পুরাতন কাহিনীর পুনঃপুনঃ আন্দোলনে নিকোলা ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। লোকে তাহার জীবনের পূর্বকাহিনী ভুলিয়া যাক,—এই ছিল নিকোলার অন্তরের কামনা। কিন্তু লোকে তাহা ভুলিত না। এই সমস্ত আলোচনা ক্রমশঃ নিকোলার অসহ্য বোধ হইতে লাগিল। তবুও অনেক কষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া দিনের পর দিন সে কারখানায় কাজ করিতে লাগিল, মনিব-গৃহিণীর কাছে হাজিরাও বন্ধ হইল না।

শেষে একদিন অনেকক্ষণ ধরিয়া চশমা সাফ করিয়া গলা খাঁখার দিয়া অনেক ঘুরাইয়া ফিরাইয়া মনিব-গৃহিণী বলিলেন, "দেখ বাপু, তুমি বেশ কাজের লোক, তা আমি জানি। কিন্তু অনেকে বলে, ওলফ্‌ বড় ভাল লোক ; খুব বিশ্বাসী। আর দেখ, আমি এখন বুড়ো হয়ে পড়েছি, এখন একজন বিশ্বাসী লোকেরই বিশেষ দরকার,—না, না, তুমি যে বিশ্বাসী নও, এমন কথা আমি

বলছিনে,—আচ্ছা, আজ যাও, ভেবে দেখি,—ভাল করে চারদিক ভেবে দেখি।”

যে আশায় নির্ভর করিয়া হল্‌ম্যান্‌-গৃহিণীর কাছে নিকোলা বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছে, মনিব-গৃহিণীর এই জবাবে তাহা একরূপ ধূলিসাৎ হইয়াই গেল।

তার পরদিন নিকোলা কারখানায় যাইতেই সবাই গা টেপাটিপি করিয়া হাসিতে লাগিল। নিকোলা বুঝিল, মনিব-গৃহিণী যে একরকম ঝাড়িয়া জবাব দিয়াছেন, সে খবর উহারা রাখে। সে যাহাই হোক্‌, নিকোলা অত সহজে দাবি ছাড়িতেছে না। অত সহজে সে দমিবার পাত্র নয়।

ওলফ্‌ এম্‌নি ভাব দেখাইল যেন কিছুই হয় নাই। সে অতীব ভদ্রভাবে নিকোলার কাজের সাহায্য করিতে গেল।

নিকোলা মুখ ফিরাইয়া বলিল, “কাজের সময় আমি কাউকে দালালী করতে ডাকিনি; আমি নিজেও কারু কাজের উপর খোদ্‌কারি ফলাইনে। যে ভাল চায় সে সরে যাক, নইলে পিটুনির চোটে তার পিঠখানা এখুনি রাঙা লোহার মতো গরম হয়ে উঠবে।”

সবাই নিস্তব্ধ, কেহ জবাব করিতে সাহস করিল না।

টিফিনের সময়ে কিন্তু এই ব্যাপার লইয়া মহা আন্দোলন চলিতে লাগিল। নিকোলা ওলফ্‌কে মারিবে বলিয়া শাসাইয়াছে,—সবাই সাক্ষী। হাতুড়ি দিয়া লোকটা শুধু লোহাই পিটে না, হাড় গুঁড়াইতে পারে! লোকটা কি! মানুষ?

নিকোলা উহাদের কথায় কর্ণপাত করিল না। ওস্তাদ হীগবার্গ পর্যন্ত কখনো নিকোলার কোনো খুঁৎ পায় নাই। কুছ্‌পরোয়া নেহি;—নিকোলা বাইস্‌ম্যানির আশায় একরূপ জলাঞ্জলি দিয়াই দৈনিক কাজকর্ম করিতে লাগিল।

নিকোলা হীগবার্গকে মধ্যস্থ মানিবে; ওস্তাদ যাহাকে পছন্দ করে সে-ই বাইস্‌ম্যান হোক। শেষ পর্যন্ত এই প্রস্তাবই সে মনিব গৃহিণীর কাছে করিবে।

এমনি করিয়া দেখিতে দেখিতে দুই মাস কাটিয়া গেল।

মনিব ঠাকুরাণীর মতলব কি? আর তো বাইস্‌ম্যান না হইলে কারখানা চলে না। যাহাকে হোক বাহাল করুন!

ইহারও পরে একদিন সকালে এক চিরকুটে নূতন বাইস্‌ম্যানের

নাম লিখিয়া মনিব-ঠাকুরাণী একজন লোকের মারফত কারখানায় পাঠাইয়া দিলেন।

* * * *

গ্রীষ্মকালের সুদীর্ঘ দিনের অবসানে সন্ধ্যা নামিতেছে। হল্‌ম্যান্‌-গৃহিণীর বাসাবাড়ীর ছোট ছোট জানালাগুলি আগাগোড়া সব খোলা। জানালা দিয়া যাহাদের দেখা যাইতেছে, তাহাদের সকলেরই পোশাক অল্পবিস্তর পাতলা, অল্পবিস্তর ঢিলাঢালা। নিশ্বাসের মতো মৃদু বাতাসে দড়ির উপরকার কাপড়গুলা মাঝে মাঝে অল্প দুলিয়া উঠিতেছে।

নীচেকার তলায় একটা জানালার পাশে, জলের কল খুলিয়া দিয়া জামার আস্তিন গুটাইয়া একটি ছিপছিপে মেয়ে এক টব কাপড়-জামা কাচিতেছে। মাঝে মাঝে তাহার মুখও দেখা যাইতেছে। মেয়েটি হঠাৎ চম্‌কিয়া কাপড়-কাচা বন্ধ করিল।

বিজয়গর্বে টুপিটা একেবারে মাথার পিছনের দিকে ঠেলিয়া দিয়া নিকোলা হাসিতে হাসিতে তাহার কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

"দুনিয়া বেশ জায়গা, সিলা! বেশ জায়গা; মানিয়ে নিতে পারলেই হয়। মুরুব্বি যদি না-ই থাকে, তবে নিজেই নিজের মুরুব্বি হয়ে পড়তে হয়। নিজেই নিজের মুরুব্বি!"

"আচ্ছা নিকোলা, মা যে বাড়ী নেই তা কি করে জানলে তুমি?"

"হুঁঃ! আমি যা জানি না এমন কিছু আছে নাকি!···তবে শোনো, আমার মার মুখে শুনতে পেলুম যে তোমার মা আজ বাড়ী নেই, আণ্টনিদের বাড়ী কাপড় ইস্ত্রি করতে গেছে। বাস্‌!···তাই তো! সন্ধ্যা হয়ে এল;······ দেখ শিলা, তুমি হয়তো শুনে খুশী হবে,—আমি বাইস্‌ম্যান হয়েছি। আজ সকালে মনিব-ঠাকরুণ আমাকেই বাহাল করেছেন। তার মানে মাসিক আরো দশ ডলার করে বেশি পাওয়া যাবে আর কি!"

"বাইস্‌ম্যান? সত্যি? অ্যাঁ! বল কি?···সত্যি!" সিলা কাপড়ের টব ফেলিয়া নিকোলার কাছে সরিয়া আসিল।

"এস, এস, তোমার মুখ-চোখ ধুয়ে দিই, যে কালিঝুলি মেখেছ! ওর ভিতর থেকে বাইস্‌ম্যানকে আমি চিনে উঠতে পারছি নে!······সত্যি? সত্যি বাইস্‌ম্যান হয়েছ?··· ··তা হলে ওলফ্‌ হ'ল না। আচ্ছা, অন্ত

মিস্ত্রিরা এখন আর তোমার মনিব-ঠাকরুণকে ভয় দেখাচ্ছে না? তোমার সম্বন্ধে পাঁচ কথা লাগাচ্ছে না?"

"বোধ হয় হীগবার্গ সব ঠিক করে দিয়েছে। নইলে যে রকম লাগাতে শুরু করেছিল, তাতে কি আর হ'ত?"

"সেই—যে থেকে ওল্‌ফের হাতের কাজ তোমাকে ফের ভেঙে গড়তে হুকুম হয়, সেই থেকে ওরা চটে আছে। তোমার এই উন্নতিতে হিংসেয় এইবার সব ফেটে মরবে আর কি। এখন আবার নতুন করে তোমায় কোনো ফাঁদে ফেলবার চেষ্টা না করলে বাঁচি।"

"নাঃ! আর কোনো গোল হবে না। দুনিয়া খাসা জায়গা, যে কাজের লোক সেই কাজ পায়।...আজ সকালেই সইটই সব হয়ে গেছে; বাঁচা গেছে। এইবার টাকাটা চট্‌পট্‌ জমিয়ে ফেলতে পারব। আর দেরী হলে মুশকিলে পড়তে হ'ত। মা যে টাকাটা নিয়েছিল—সে—সে তো হয়ে গেছে। মার ব্যবসাতে বোধ হয় উল্‌টা দিকে লাভ হচ্ছে!"

"হ্যাঁ! এতক্ষণে! দেখ দেখি,—মুখখানি যেন ঝক্‌ঝক্ করছে।"

"কারখানা থেকে সিধে তোমার কাছে চলে এসেছি—খবরটা দিতে। রাস্তায় মাকেও খবরটা দিয়ে এসেছি—বলে এসেছি,—আজ রাত্রের জন্ত দুটো ম্যাকারেল মাছ কিনতে যাচ্ছি। আজ আবার দু নৌকো বোঝাই ম্যাকারেল এসেছে।"

সিলার মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল—খবরের মতো খবর বটে। সিলা ও নিকোলা উভয়েই শৈশব হইতে শহরে বাস করিতেছে। সুতরাং ম্যাকারেল আসার সঙ্গে তাহাদের অনেক স্মৃতি জড়িত;—বিশেষতঃ ছেলেবেলায় জেঠির ধারেই তাহাদের বাসা ছিল।

সিলা অল্পক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "আমি গায়ের কাপড়খানা নিয়ে তোমার সঙ্গে যাব? যাই, কি বল? তুমি ওই মোড়ে গিয়ে দাঁড়াও, পাড়ার ভিতরটা আমাদের একসঙ্গে যাওয়া ঠিক হবে না; দাঁড়িয়ো, বুঝলে? আমি এলুম বলে।"

সিলা উৎসাহে মাতিয়া উঠিয়াছিল, সংযমের চেষ্টা অসম্ভব। তাহার উপর নিকোলার আজ মাহিনা বাড়িয়াছে! সে আজ বাইস্‌ম্যান!

সিলা তাড়াতাড়ি নীল ছিটের পোশাকটা পরিয়া গায়ের কাপড় জড়াইয়া বাহির হইয়া পড়িল এবং নিকোলার পিছনে পিছনে চলিল।

অল্প দূরে গিয়াই উহারা একসঙ্গে চলিতে লাগিল। সিলার সেই আগেকার মতো স্ফূর্তি, নিকোলার সেই তন্ময় দৃষ্টি। কোলাহলের মধ্যে ধূলার ভিতর দিয়া উহারা চলিয়াছে, নিকোলা কিন্তু দেখিতেছে শুধু সিলাকে,—হাস্যময়ী, লঘুহৃদয়া, কৃষ্ণনয়না সিলাকে।

ম্যাকারেলের আমদানীতে রাস্তায় ঘাটে আজ বেজায় ভিড়। পুলের উপরে কত লোক রেলিঙের উপর ঝুঁকিয়া মাছের নৌকা দেখিতেছে এবং মাঝে মাঝে পিছন হইতে ধাক্কা খাইয়া বিরক্তভাবে ঘাড় ফিরাইতেছে। আজ রাত্রে শহরসুদ্ধ লোক ম্যাকারেল খাইবে।

এই সূক্ষ্মপুচ্ছ, বিদ্যুৎগতি, সমুদ্রচারী, নীলহরিৎ ম্যাকারেল আজ দুই দিন যাবৎ বাজারের শোভা বর্ধন করিতেছে। একদিন পূর্বেও ইহার আমদানী এত অল্প ছিল যে, শহরের সকল বড়লোকের পাতে পড়িয়াছিল কিনা সন্দেহ। হঠাৎ 'হ্বাল' দ্বীপ হইতে উপর্যুপরি একেবারে দুই-তিন নৌকা আসিয়া পড়াতে বাজার একেবারে নামিয়া গিয়াছে। এখন প্রত্যেকটার দাম দুই পেন্স আড়াই পেন্স মাত্র। সুতরাং মুটে মজুর সকলের ভাগ্যেই আজ ম্যাকারেল।

আজ শহরের প্রত্যেক হাঁড়িতে ম্যাকারেল, প্রত্যেক কটাহে ম্যাকারেল, প্রত্যেক কেট্‌লিতে ম্যাকারেল। বন্দরে প্রত্যেক জাহাজে ম্যাকারেল, প্রত্যেক নৌকায় ম্যাকারেল, মাঝি-মাল্লাদের প্রত্যেক শান্‌কিতে ম্যাকারেল। এই গরমের দিনে প্রত্যেকের হাতেই দুই-তিনটা মাছ। ভাজা ম্যাকারেলের গন্ধে আজ সারা শহরটার হাওয়া ভরপুর।

মাছওয়ালা বলে, "যে গরম, আজ বেচতে না পারলে কাল সব পচে যাবে।"

"জন্ম জন্ম গরম পড়ুক, গরীব লোক খেয়ে বাঁচুক।" খরিদ্দারের মুখে ঐ এক কথা।

নিকোলা ও সিলা একেবারে নৌকার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া মাছের দর করিতেছিল। সিলা এবিষয়ে খুব পটু, ছেলেবেলা হইতে তাহার এ বিষয়ে বেশ একটু দক্ষতা আছে। মেছুনি তাহার হাতে যে মাছ দুইটা তুলিয়া দিয়াছিল, সিলা সে দুইটা নৌকার উপর ফেলিয়া বলিয়া উঠিল, "না বাছা, এ সূর্য্যিপক চিম্‌সে মাছ আমার চাইনে। ঐ তলা থেকে তুলে দাও দেখি,—হ্যা, ঐ—ঐ দুটো।"

সিলা টিপিয়া টুপিয়া বেশ করিয়া দেখিল, মাছ দুইটা নরম হইয়া যায় নাই।

নিকোলা দাম দিবার জন্য পকেটে হাত দিয়াছে, এমন সময় তাচ্ছিল্যের ভাবে সিলা মাছ দুইটা আবার নৌকার পাটায় ফেলিয়া দিল।

"এঃ! এ যে বাসি! চোখ দুটো একেবারে কড়ির মতো হয়ে গেছে!"

"এই চমৎকার"—

"তুমি জান না নিকোলা, তুমি কিছু চেন না!···তা দেখ বাছা, এ মাছ যদি আমাদের ঘাড়ে নিতান্তই চাপিয়ে দিতে চাও তো ও দামে হবে না, দু-এক পয়সা কমিয়ে নিতে হবে।"

শেষে দুই পেন্স করিয়া চারি পেন্সেই মেছুনি রাজী হইল।

* * * *

বার্বারা দরজায় দাঁড়াইয়া নিকোলার প্রত্যাবর্তনের প্রতীক্ষা করিতেছিল। হঠাৎ সে দেখিল দূরে সিলা, তাহার পিছনে একজোড়া ম্যাকারেল হাতে নিকোলা।

বার্বারা সিলাকে মাছ চাখিবার নিমন্ত্রণ করিল। বার্বারা খাইতে ও খাওয়াইতে সমান মজবুত।

সেদিন সারাটা সন্ধ্যা বার্বারার তোলা উনুনে 'ছ্যাক ছোঁক' শব্দে ম্যাকারেল ভাজা চলিতে লাগিল। ভাজার গন্ধে ক্ষুধাটাও একেবারে তাজা হইয়া উঠিল।

বার্বারা মোটা মানুষ,—হাত তেমন চট্‌পট্‌ চলে না,—হাতাও নড়ে না। সিলা হাতে হাতে যোগাড় দেওয়াতে একরকম করিয়া সেদিনের রন্ধন-ব্যাপার চুকিল।

এইবার গরম গরম কড়া হইতে তুলিয়া পাঁউরুটি দিয়া ভাজা মাছ খাইবার পালা।

ঘর দালানের তপ্ত দেওয়াল মৃদুমন্দ সন্ধ্যার হাওয়ায় ক্রমে জুড়াইয়া আসিতেছে। যে তিনটি প্রাণী ঘরের মধ্যে ম্যাকারেল খাইতেছে, তাহাদের পক্ষে এ রাত্রি উৎসবের রাত্রি।

নিকোলা আজ বাইস্‌ম্যান, কারিগরের রাজা!

এগারো

আজকাল মায়ের ভয়ে বাড়ীতে সিলার টুঁ শব্দ করিবার জো নাই; কারখানায় তবু বেচারা পাঁচজনের সঙ্গে কথা কহিয়া বাঁচে।

এখন সে ক্রিস্টোফা-জোসেফাদের সঙ্গে সন্ধ্যাবেলা বেড়াইতে পায় না! বেড়ানোর আমোদ অন্যরূপে মিটায়। সিলা উহাদের সান্ধ্য কাহিনীর বর্ণনা শোনে। দুধের সাধ ঘোলেই মেটে।

ক্রিস্টোফার কী বর্ণনাশক্তি! সে তুচ্ছ জিনিসকেও বলিবার গুণে মনোরম করিয়া তোলে। নাচের কথা, ভোজের কথা, চড়ুইভাতির কথা, বড়লোকের ছেলেদের উদারতার কথা সে এমন গুছাইয়া সাজাইয়া রংদার করিয়া বলিতে পারে যে, মানুষের লোভ হয়। ক্রিস্টোফার বর্ণনার গুণে তুচ্ছ বিষয় রূপকথার মতো চমৎকার হইয়া ওঠে। সিলা বাড়ী গিয়াও মনে মনে ঐসব কথারই আলোচনা করে।

সম্প্রতি সিলার নিজের জীবনেও উপন্যাসের হাওয়া লাগিয়াছে; সে যখনই বার্বারার দোকানে কোনো জিনিসের প্রয়োজনে যায়, তখনই লাড্‌ভিগ ভীর্গ্যাঙের চুরুট ধরাইবার দরকার হয়; সেও সঙ্গে সঙ্গে বার্বারার দোকানে ঢোকে। এ কথা কিন্তু সিলা নিকোলাকে বলে নাই।

এই সেদিনও যখন উহাকে দেখিয়া সিলা তাড়াতাড়ি দোকান হইতে চলিয়া আসিতেছিল তখন উহাকেই লক্ষ্য করিয়া লাড্‌ভিগ বলে, "আমি কি এতই ভয়ঙ্কর? ওগো কৃষ্ণনয়না সুন্দরী! আমায় দেখে তুমি পালাও কেন? হাঃ হাঃ হাঃ! কালো চোখ কি ঢেকে রাখবার জিনিস। হাঃ হাঃ হাঃ!"

ইদানীং সিলার এই সমস্ত কথা নিতান্ত মন্দ লাগিত না। লাড্‌ভিগের "পটুচাটুশতৈঃ" উহার মন একেবারে অনুকূল না হইলেও প্রতিকূলতার মাত্রা যে ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। লাড্‌ভিগের আবির্ভাব এখন উহার চক্ষে অন্ধ-কারারুদ্ধ বন্দীর পক্ষে সূর্যালোকের মতো সুন্দর।

বাহিরের আচরণে কোনো বৈলক্ষণ্য লক্ষিত না হইলেও আকারে সিলা দিন দিন আরো যেন শুকাইয়া উঠিতে লাগিল। তাহার ডাগর চোখ

ড্যাবড্যাবে হইয়া উঠিল। হল্‌ম্যান্‌-গৃহিণীর কিন্তু সেদিকে দৃষ্টি ছিল না। সিলা যে কলের খাটুনি খাটিয়াও বাড়ীর প্রায় সমস্ত কাজের ভার নিজের স্কন্ধে লইয়াছে, ইহাতেই সে খুশী।

আজকাল কালেভদ্রে নিকোলার সঙ্গে দেখা হইলে সিলা নিজের সুখহীন জীবনের কথা বলিতে বলিতে একেবারে বিমর্ষ হইয়া যায়। যে সব তুচ্ছ ব্যাপারে সকল মেয়েরই স্বাধীনতা আছে—শুধু তাহারই নাই—সেই সব কথা বলিতে বলিতে বেচারা কাঁদিয়া ফেলে। ছেলেবেলা হইতে উহাকে চোখ-রাঙানির চোটে দাবাইয়া রাখা হইয়াছে। এখন তো কলে কুলি, বাড়ীতে চাকরাণীর অধম।

এইরূপ আলোচনা করিতে করিতে সিলার চিন্তাস্রোত সহসা ভিন্ন পথেও চলিতে আরম্ভ করিত। নিজের ঘর-সংসার হইলে সে যে কত সুখী হইবে, নিকোলার সঙ্গে ছুটির দিনে কত জায়গায় বেড়াইবে, কত নাচিবে, কত গাহিবে তাহারই আলোচনায় একেবারে মাতিয়া উঠিত। উৎসাহে তাহার দুই চোখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিত।

আবার, একটু পরেই বেচারা কেমন যেন বিষণ্ণ, বিমর্ষ।

নিকোলা দেখিল, এখন ঘাড় গুঁজিয়া একমনে হাতুড়িপেটা ছাড়া সিলাকে উদ্ধার করিবার অন্য উপায় নাই। খাটিয়া খুটিয়া সাম্‌নের শীতের শেষ নাগাদ সে এক শত ডলার জমাইতে পারিবে। হায়! তাহার পুর্বে সিলার মলিন মুখে হাসি ফুটিবে না।

*　　*　　*　　*

জর্জিনা বলিয়া একটি মেয়ে সিলাদের পাশের বাড়ীতে থাকে। সে জুতার সাজ সেলাই করে। হল্‌ম্যান্‌-গৃহিণীর মতে মেয়েটি ভারি শিষ্ট শান্ত। সুতরাং সিলা উহার সঙ্গে বন্ধুত্ব করিবার হুকুম পাইল। এমন কি একটা রবিবার উহার সঙ্গে শহরে বেড়াইতে যাইবারও হুকুম হইয়া গেল। সিলার আর আনন্দের সীমা নাই। খাঁচার পাখী যেমন করিয়া মুক্তির দিনের পথ চাহিয়া থাকে, সিলা সেইরূপ ঔৎসুক্যে রবিবারের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

রবিবার আসিল। সেদিন সিলার মনে হইতে লাগিল, 'সুপ্‌' রন্ধন বুঝি আর শেষ হইবে না। তাহার পর আবার জর্জিনার জন্য অপেক্ষা। উহার আর সাজগোজ ফুরায় না।

শেষে পোস্ট অফিসের পুলিন্দার মতো আঁটা-সাঁটা অবস্থায়, চুলে চর্বি লেপিয়া

জর্জিনা বাহির হইল। সিলা আর দ্বিরুক্তি না করিয়া উহার হাতের ভিতর হাত গলাইয়া দিয়া বুনো ঘোড়ার মতো লাফাইতে লাফাইতে বাহির হইয়া পড়িল। উহারা আজ শহরে চলিয়াছে। কী আমোদ! কী আমোদ!

সময়ে পৌছিতে না পারিলে, কোম্পানী বাগানের 'ব্যাণ্ড্' শুনিতে পাইবে না বলিয়া, সিলা জর্জিনাকে একরকম টানিতে টানিতে যথাসাধ্য বেগে চলিতেছিল।

পথে এবং পার্কে লোকের মেলা। বড়লোকের মেয়েরা ভাল ভাল পোশাক পরিয়া বেড়াইতে আসিয়াছে। গোলাপী ফিতা! শুভ্র ওড়না। সুন্দর টুপি! তাই দেখিতেই সিলা ও জর্জিনার অর্ধেক সময় কাটিয়া গেল।

রবিবার পবিত্র বার এবং বিশেষ করিয়া ভজনার দিন বলিয়া প্রত্যেক ভদ্রলোক এবং ভদ্রমহিলাই আজ অস্বাভাবিক রকম গম্ভীর। সিলার এই দৃশ্য ভারি অদ্ভুত মনে হইতেছিল। আজ ছুটির দিন, ছুটির দিনে এত গাম্ভীর্য তাহার চক্ষে ভারি বিসদৃশ ঠেকিতেছিল। শেষে দুইজনে মিলিয়া বাগানের বাহির হইয়া কেল্লার চতুর্দিকে এক চক্র ঘুরিয়া আসিল। কেল্লার সান্ত্রী হাঁকিল, "Relieve guard!" অপরাহ্নের ক্লান্ত হাওয়ায় মনে হইল লোকটা উচ্চৈঃস্বরে হাই তুলিতেছে। দূরে নিস্পন্দ রৌদ্রে নদীর উপর দিয়া নৌকা চলিতেছিল।

এখানেও দ্রষ্টব্য বিশেষ কিছুই না পাইয়া উহারা জেটির দিকে চলিল। সেখানেও সেই রবিবাসরীয় নিস্তব্ধতা।

বাজারে কয়েকটা নিষ্কর্মা লোক পরস্পরের ঘড়ি লইয়া অতি সূক্ষ্মভাবে নিরীক্ষণ করিতেছে। উহারা পরস্পরে ঘড়ি বদল করিবে। এ এক খেলা! অদৃষ্ট পরীক্ষার খেলা বদলাইবার আগে তাই ভাল করিয়া পরীক্ষা করিতেছে।

গীর্জায় ঘণ্টা বাজিতেছে, সান্ধ্য উপাসনার আর বিলম্ব নাই।

ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত ও পিপাসার্ত হইয়া উহারা বাড়ী ফেরাই মনস্থ করিল। হঠাৎ একটা মোড় ফিরিয়া, কেল্লার খেয়াঘাটে জাহাজের আনাগোনা ও লোকের ভিড় দেখিয়া সিলা বলিল, "চল জাহাজে করে ওপার থেকে বেড়িয়ে আসি, পথে পথে আর ধুলো খেতে পারিনে।"

জর্জিনা বলিল, "নাঃ, ভারি লোকের ভিড়, আর বেলাও গিয়েছে। দেরী হলে তোমার মা আবার রাগ করবেন।"

"এই বুঝি তোমার বেড়ানো? বেড়িয়ে খুশী হয়েছ? চল না, দিব্যি জাহাজের সামনের দিকে বসে একটু হাওয়া খেয়ে আসা যাক। চল, চল।"

জর্জিনা অগত্যা স্বীকৃত হইল।

ওপারে যে জায়গাটায় জাহাজ লাগে, সেটা একটা দ্বীপের মতো। জাহাজ হইতে নামিয়া সিলা ও জর্জিনা দেখিল, সাম্‌নে একটা জায়গায় মেলা বসিয়াছে, নানা রকম তামাশা চলিতেছে। একটা তাঁবুর ভিতরে নাচের তালে বাজনা বাজিতেছে। ভিতরে হাসির শব্দ, গল্পের গুঞ্জন। বাজনা শুনিয়া সিলা সেইখানে দাঁড়াইতেছিল, কিন্তু জর্জিনা উহাকে দাঁড়াইতে দিল না; সে বলিল, "ছিঃ, কোনো গেরস্তর মেয়ে ওখানে দাঁড়ায় না, চলে এস।"

সিলা অনিচ্ছাসত্ত্বেও জর্জিনার পিছনে পিছনে চলিল। কিন্তু উহার মন পড়িয়া রহিল ঐ তাঁবুর প্রান্তে! নাচের তালে বাজনা বাজিতেছিল, আর সেই তালে তালে সিলার সর্বাঙ্গে রক্তধারাও আনন্দে নৃত্য করিতেছিল।

খানিক দূরে গিয়া—তখনো উহারা তাঁবুর সীমা ছাড়াইয়া যায় নাই—সঙ্গীতমুগ্ধ সিলা পুনর্বার তাঁবুর বেড়ার পাশে দাঁড়াইয়া উঁকিঝুঁকি মারিতে লাগিল। এবারে জর্জিনা একেবারে রাগিয়া উঠিল। সে বলিল, "থাক তুমি একলা; আমি চললুম এখুনি! নিজের মান-সম্ভ্রমের জ্ঞান নেই? তোমার না থাকে আমার তো আছে, আমি এখানে দাঁড়াতে পারব না।"

তফাতে দাঁড়াইয়া একটু বাজনা শুনিলে কি করিয়া যে মানের হানি হয় বা রং চটিয়া যায়, সিলা তাহা কিছুতেই বুঝিতে পারিল না। আর যদি কিছুই দেখিবে না শুনিবে না, তবে বেড়াইতে আসিবারই বা দরকার কি ছিল? আর এতক্ষণ তো ঘুরিয়া বেড়ানো হইল, ভদ্র রকমের আমোদের তো সন্ধান পাওয়া গেল না!

জর্জিনা যখন কিছুতেই বাগ্‌ মানিল না, তখন বাধ্য হইয়া সিলা জাহাজেই ফিরিল।

যখন বাড়ী ফিরিল, তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। পায়ে ফোস্কা, গায়ে মাথায় ধুলা, শরীর অবসন্ন, মন অতৃপ্ত।

মায়ের কাছে ভ্রমণের বিবরণ বলিতে বলিতে চেয়ারের উপরেই সিলা ঢুলিয়া পড়িল। তাঁবুর ভিতরকার বাজনার তাল এখনো তাহার মাথায় ঘুরিতেছে। সে স্বপ্নে দেখিল, যেন সে এক নাচের মজলিসে নিমন্ত্রিত।

শরতের শেষে, যাহারা পয়সা খরচের ভয়ে বাড়ীতে আগুন পোহায় না, তাহারা সন্ধ্যাবেলায় বার্বারার দোকানে আসিয়া জোটে। গল্পগুজবও হয়, বিনি পয়সায় চা খাওয়ারও মানা নাই।

আজকাল কিন্তু বার্বারার মেজাজ ঠিক আগেকার মতো মোলায়েম নাই। মাঝে মাঝে সে চটিতে শুরু করিয়াছে। তাহার চা-বিতরণের মধ্যেও কার্পণ্যের চিহ্ন দেখা দিয়াছে। আজকাল সে কোনো দিন কৃপণ, কোনো দিন দাতা। ইহার অবশ্য নিগূঢ় কারণ আছে। চিনির মহাজন, ময়দার মহাজন, চা-ওয়ালা, তেলওয়ালা সবাই আবার টাকার তাগিদ দিয়াছে। ফুটা বাক্সের যে অবস্থা তাহাতে তো একজন মহাজনেরও দেনা শোধ হইবার সম্ভাবনা নাই।

সময় দেখিতে দেখিতে চলিয়া যায়, কাল বাদে পরশু মহাজনের লোক আসিবে। উপায়? সে দুই-এক জায়গায় ধারের চেষ্টা করিল, সেদিকেও সুবিধা হইল না। তাই তো! উপায়? দোকানপাট শেষে গুটাইতে হইবে না তো!

নিকোলাকে বার্বারা সেই কথাই জিজ্ঞাসা করিতেছিল, বলিতেছিল, "এখন উপায়?"

নিকোলা যে ইহার কোনো সদুপায় ঠাওরাইতে পারিয়াছে, তাহা তো তাহার মুখ দেখিয়া বোধ হয় না!

বার্বারা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "যা দেখতে পাচ্ছি, তাতে সব মালপত্র আদালতে উঠিয়ে নিয়ে নীলাম করবে, আর কি! শেষে আটত্রিশ ডলারের জন্যে—এত পয়সা খরচ, এতদিনের পরিশ্রম—সব জলে যাবে!"

ইহার পরে বার্বারা যে কী বলিবে, তাহা নিকোলার পক্ষে আন্দাজ করা শক্ত নয়। সে বুঝিল যে, এখন সে একটু সহানুভূতি দেখাইলেই বার্বারা আবার তাহারই ঘাড় ভাঙিয়া টাকা আদায় করিবে। অথচ, বার্বারার যে রকম হিসাবের জ্ঞান, ব্যবসায়-বুদ্ধি, তাহাতে বারংবার টাকা ঢালিলেও দোকানের যে কোনো কালে উন্নতি হইবে সে আশাও দুরাশা। ওদিকে নিকোলা এত কষ্ট করিয়া যে উদ্দেশ্যে টাকা জমাইয়াছে সে উদ্দেশ্যও বিফল হইতে দেওয়া যায় না। আরও দিন পিছাইলে, সিলাকে কষ্টের মধ্যে শান্ত করিয়া রাখা মুশকিল হইবে।

নিকোলা নীরবে চিম্‌নির আগুনের দিকে চাহিয়া রহিল। কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না।

নিকোলা কোনো জবাব দিল না দেখিয়া বার্বারা কাঁদিতে আরম্ভ করিল। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল. "ভেবেছিলুম, ছেলে রোজগার করতে শিখলে,—আমার দুঃখু ঘুচবে; আর কিছু না হ'ক অন্ততঃ সময়ে অসময়ে আর পরের দরজায় হাত পাততে হবে না।"

"তুমি তো জান মা, কেন দিতে পাচ্ছিনে, তুমি তো সব জান। আর তা'ছাড়া তোমার ও দোকানে কোনো দিন সুবিধা হবে বলে তো আমার বোধ হয় না। তার চেয়ে সময় থাকতে ছেড়ে দেওয়াই বোধ হয় ভাল। দোকানে এ পর্যন্ত কি এক পয়সা লাভ হয়েছে?"

বার্বারা চটিয়া গেল। সে বলিল, "তা কি করতে হবে? বুড়ো গরু বলে কসাইয়ের হাতে দেব নাকি? আমি দোকান তুলে দিয়ে দেউলে হ'ব, আর লোকে টিটকারী দেবে এই যদি তোমার মনের কথা হয় খুলে বলে ফেল। ...তুমি এ বেশ জেনো যে, তুমি টাকা না দিলেও আমার দোকান বন্ধ হবে না, আর আমিও দেউলে হব না! বেঁচে থাক লাড্‌ভিগ—টাকার ভাবনা কি? একবার মুখের কথা খসালে হয়। আর, বারবার যে তোমার জন্মে আমি দুঃখু সইব একথা তুমি মনেও ভেব না। একবার তোমার জন্মে আমি কৌঁসুলী সাহেবের বাড়ীর অমন সুখের চাকরি হারিয়েছি; আবার?...অবাক হয়ে গেলে যে? লাড্‌ভিগকে মারপিট করে, আমার চাকরির দফা নিশ্চিন্তি করে, এখন একেবারে হাবা হলেন! নইলে আমার চাকরি কি যেত?—আজ একটা বিপদে পড়েছি তাই টাকা চেয়েছি, তাও ধার চেয়েছি; তবুও দিতে পারলেন না, ওঁর আরেক জনের জন্ম টাকার দরকার।...শুধু তাই? লাড্‌ভিগ আমার ছেলের মতো—তার কাছে টাকা ধার নেব, তাও তুমি নিতে দেবে না। এ যে তোমার কী একগুঁয়েমি তা বুঝতে পারিনে।...আর আমি তোমার মান-অপমানের ভাবনা ভেবে চলছিনে; সে ভাবতে গেলে আমার চলবে না। তোমার কাছে সাহায্য চাইলুম, তুমি সাহায্য করতে পারলে না; ভাল, যে পারে তার কাছেই যাব। দোকান বন্ধ হওয়া মানে ডান হাত বন্ধ হওয়া; সে তো আর মুখের কথা নয়,...কাজেই বাধ্য হয়ে যেতে হবে। ..ভাগ্যিস্, এ হাঙ্গামাটা এই হপ্তায় ঘাড়ে এসে পড়েছে, নইলে সামনের হপ্তায় শুনছি লাড্‌ভিগ আবার কোথায় হাওয়া খেতে যাবে। সে সময়ে এমনিধারা বিপদে পড়লেই হয়েছিল আর কি!"

নিকোলার ঠোঁট কাঁপিতেছিল, সে জামার আস্তিন দিয়া ইহার মধ্যে

দুই-তিন বার কপালের ঘাম মুছিয়াছে। বার্বারা থামিলে, সে ধীরে ধীরে মুখ তুলিয়া বলিল —"পাবে ; টাকা আমিই দেব।"

হায়! বিবাহের মামলা আবার মুলতুবি! ক্ষোভে নিকোলার চোখ দিয়া জল আসিতেছিল।

নিকোলা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। বার্বারার কথা আজ তাহার বুকে বাজিয়াছে। নিকোলাই যে বার্বারার সকল দুঃখের মূল এ কথাতে সে 'হতভম্ব' হইয়া গিয়াছে।

এই তো, বিবাহের সম্ভাবনা তিন মাসের মত পিছাইয়া গেল। আবার যদি বার্বারা টাকা চায়? নিকোলা হতাশ হইয়া পড়িল।

হপ্তার শেষে রোজগারের টাকা বাক্সে রাখিতে রাখিতে নিকোলার কেবল মনে হইতেছিল,—মিথ্যা সঞ্চয়; যে কোনো দিন খুশি, বার্বারা ইহা নিঃশেষে গ্রাস করিতে পারে। অবশ্য সে অধিকার তাহার আছে, একদিন নিকোলাও বার্বারার রোজগারের টাকায় জীবন ধারণ করিয়াছে।...তবু!...তবু আর কি?

তারপর, বার্বারা নিকোলার মাতা, অথচ পিতৃনামের গৌরবে গর্ব অনুভব করিবার অবসরটুকুও সে নিকোলাকে দিতে পারে নাই, এজন্য সেই তো জগতের চক্ষে অপরাধী। নিকোলাকে সে স্তন্য পর্যন্ত দেয় নাই। এখন সেই কিনা তাহার উপার্জনের টাকা দাবি করিতেছে। সেই তাহার জীবনের সুখ, হৃদয়ের শান্তি গ্রাস করিতে বসিয়াছে।

নিকোলা বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে, তাহার জীবন এখন তিক্ত।

সে কি লিলার আশা ছাড়িয়া দিবে? অসম্ভব, নিকোলার একখানা হাড় থাকিতে তো নয়।

মানবজন্ম যখন লাভ করিয়াছে, তখন মানুষের মতো মাথা তুলিয়াই সে চলিবে। এজন্য যদি দেহ হইতে মাথাটা বিচ্যুত হইয়া পড়ে, তাহাতেও নিকোলা প্রস্তুত।

বার্বারার দোকানের জন্য সে আর এক পয়সাও খরচ করিবে না। বার্বারা খাইতে না পায় নিকোলার কাছে আসুক, বার্বারার ভরণপোষণের ভার নিকোলার। কিন্তু দোকানের জন্য আর এক পয়সাও না।

ভবিষ্যতের বিষয়ে এইরূপ একটা নিষ্পত্তি করিয়া নিকোলার মাথা অনেকটা খোলসা হইয়া গেল।

এবার বিবাহ বন্ধ হইল বটে. কিন্তু আর এমনটা ঘটিতে দেওয়া হইবে না। কারণ, সে নিকোলা, শহরের একটা সেরা কারখানার সেরা কারিগর, —সর্দার ; তাহার যে কথা সেই কাজ।

বারো

শীত প্রায় ফুরাইল। ফেব্রুয়ারির মেলা শুরু হইয়াছে। ঢাক বাজিতেছে, বাজিকর চেঁচাইতেছে, লটারির চাকা ঘুরিতেছে। অবিশ্রান্ত লোকের চলাচলে রাস্তায় বরফ গুঁড়া হইয়া দোবারা চিনির মতো হইয়া পড়িয়াছে। রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্যন্ত নৃত্যগীত, তৃতীয় প্রহর পর্যন্ত আমোদের অন্বেষণ।

আমোদের ঢেউ মজুর-পাড়া পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে; সমস্ত শহরটা এখন উৎসবময়।

মাপের গেলাসে মাপিয়া যাহারা আমোদ করিতে চায় এবং লোকনিন্দার ভয়ে মেলায় যাইতে সাহস করে না, তাহাদের অব্যক্ত ঔৎসুক্যের সীমা-পরিসীমা নাই। আর যাহারা নিন্দার ভয় করে না, কাহারো তোয়াক্কা রাখে না, তাহারা দলে দলে ফুর্তি করিয়া মেলার মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

মেলায় বল্ নাচের ব্যবস্থা আছে, খাবারের দোকান আছে, রঙিন লণ্ঠনের আলো আছে, প্রলুব্ধ করিবার হাজারো জিনিস সেখানে বর্তমান।

মেলা বসিবার দ্বিতীয় দিনেই ক্রিস্টোফা আসিয়া হাজির। ভারি সুখবর! একজন লোক উহাকে এবং সিলাকে বিনা পয়সায় মেলা দেখাইবে বলিয়াছে। তাহার নাম কিন্তু ক্রিস্টোফা কিছুতেই ফাঁস করিবে না। সে টিকিটেরও দাম দিবে, আবার কেকেরও দাম দিবে। ভারি মজা!

সিলা এপর্যন্ত কখনো মেলা দেখে নাই। বাহির হইতে ভিড়ের সঙ্গে মিলিয়া উঁকিঝুঁকি মারিয়াছে মাত্র। এমন সুযোগ ছাড়িয়া দিতেও উহার মন সরিতেছে না, আবার যাইতেও সাহসে কুলায় না।

সিলা বাড়ী আসিয়া মায়ের মুখে শুনিল, আন্টনিরা মেলা উপলক্ষে একখানা ঘর ভাড়া লইয়াছে, দোকান খুলিবে। সেখানে কেনা-বেচার ভার সিলার মায়েরই উপর। অবশ্য আন্টনিরা উহাকে এজন্য পয়সা দিবে। সুতরাং মেলার কয়দিন রাত্রে সিলাকে একলাই বাড়ী আগলাইয়া থাকিতে হইবে।

আনন্দে সিলার মন নৃত্য করিয়া উঠিল। এইবার তো সে ইচ্ছা করিলেই ক্রিস্টোফার সঙ্গে যাইতে পারে।

সহসা অপ্রত্যাশিত ভাবে এতটা সুবিধা পাইয়া তাহার মনে কেমন যেন আশঙ্কা হইতেছিল।

সেইদিন বৈকালে সিলা যখন লোকের বাড়ী হইতে ময়লা কাপড় লইয়া ঘরে ফিরিতেছে, সেই সময়ে কে একজন পুরুষ মানুষ উহার গা ঘেষিয়া চলিয়া গেল। সিলা চম্‌কিয়া ফিরিয়া দেখে—লাড্‌ভিগ! তবে সে ফিরিয়াছে! সিলা আর উহার দিকে চাহিতে পারিল না, লজ্জায় তাহার মুখ লাল হইয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু একবার যেটুকু দেখিয়া লইয়াছে, তাহাতেই সিলা অনুভব করিয়াছে যে লাড্‌ভিগের দৃষ্টি উহারি উপর নিবদ্ধ এবং উহাকেই লক্ষ্য করিয়া সে মৃদুমন্দ হাসিতেছিল।

সেই দামী চুরুটের মোলায়েম গন্ধ! সেই ক্রিস্টোফা-বর্ণিত উপন্যাসের নায়কের মতো দামী পোশাকের 'খুশ খাশ্' শব্দ! সিলা মোটেই ভুল করে নাই। এতক্ষণে! টিকিটের টাকা এবং কেকের পয়সা যে কে দিবে এতক্ষণে তাহা বোঝা গেল।

ত্রস্ত পাখীর মতো উহার স্পন্দিত হৃদয় উহাকে পীড়িত করিয়া তুলিল।

বাড়ী আসিয়া সে আর্শিতে নিজের মুখ দেখিল। সত্যই কি উহার কালো চোখ এত সুন্দর?

* * * *

পরের দিন, নিকোলা সিলার জন্য একটি আয়নাদার সেলাইয়ের বাক্স কিনিয়া উহারি সন্ধানে সন্ধ্যার ঝোঁকে বাহির হইয়া পড়িল। তখন সবে গ্যাস জ্বালা হইতেছে।

বাক্সের কলখানি তাহার নিজের তৈরী। বাক্সের ভিতরে সরু সুতা, ছুঁচের কৌটা, কাঁচি, আঙুল-ত্রাণ। নিকোলা বাক্সের উপর দুইখানি কেক রাখিয়া বেশ করিয়া রুমালের মধ্যে জড়াইয়া এমনি করিয়া বাঁধিয়া লইল যে, হঠাৎ দেখিলে কারিগরদের হাতিয়ারের থলি বলিয়াই ভ্রম হয়।

সিলার ঘরের কানাচে নিকোলা আজ কতবারই ঘুরিল। ঘরে আলো নাই, কাহারো সাড়াশব্দ নাই; ব্যাপার কি?

বেচারা সেলাইয়ের বাক্সটি হাতে করিয়া অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। সিলার দেখা নাই।

গলিতে একটা গ্যাসপোস্ট। সেইখানটাতেই একটু আলো, বাকীটা একরূপ অন্ধকার।

এইবার গলিতে কে আসিতেছে! নিশ্চয় সিলা। নিকোলা তাড়াতাড়ি তাহার দিকেই চলিল।

না, না, এ যে জেকবিনা! নিকোলা উহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "হল্‌ম্যান্‌-গিন্নী কি আজ ঘরে নেই?"

"না, মেলায় গেছে।"

কথাটা শুনিয়া নিকোলা নির্জনে সিলার দেখা পাইবে ভাবিয়া মনে মনে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

নিকোলা যে সিলার সন্ধানেই আসিয়াছে জেকবিনা তাহা জানিত। সে মেলায় যাইবার টিকিট পায় নাই, সেজন্য সে সিলার সৌভাগ্যে একটু ঈর্ষ্যান্বিতও হইয়াছিল; সুতরাং সে নিকোলাকে শুনাইয়া বলিল, "বেড়ালও বাড়ীছাড়া হয়েছে, ইঁদুরেরও কুঁচুনি শুরু হয়েছে। সিলাও কি আর ঘরে আছে? সে গেছে মেলায় আমোদ করতে।"

"সিলা? সিলা মেলায়!"

"কেন যাবে না? তার এখন ভাবনা কি? তার টিকিটের পয়সা দেবার মানুষ হয়েছে।"

"কে বলে এমন কথা?"

"এই আমি গো আমি; আমি ক্রিস্টোফাকে আর তাকে স্বচক্ষে যেতে দেখেছি।...আর তাছাড়া ক্রিস্টোফা আমায় নিজেই বলেছে, যে ওদের দুজনকে মেলায় নিয়ে যাবে সে ইচ্ছে করলে দশজনকেও নিয়ে যেতে পারে। তবে, বোধ হচ্ছে ওরা মেলায় যাবে না, গির্জায় যাবে।" এই বলিয়া জেকবিনা রঙ্গচ্ছলে চোখ মটকাইল।

"কী বাজে বকছ? সাবধানে কথাবার্তা কইতে শেখ নি?"

"হাঃ হাঃ! লোকটি তোমার নিতান্ত অচেনা নয়; বলতে গেলে আপনার জন। আমরা তোমার মায়ের মুখেই শুনেছি। মাস কয়েক আগে সে তোমার মায়ের হয়ে চিনির মহাজনের দেনা শোধ করেছে।"

নিকোলা আর শুনিতে পারিল না। বার্বারা উহারও রক্ত শোষণ করিয়াছে আবার উহাকে লুকাইয়া লাড্‌ভিগের কাছেও হাত পাতিয়াছে! বার্বারা, তবে, আর নিকোলার মা নয়। সে যাহাকে স্নেহ করে সে—লাড্‌ভিগ।

"লাড্‌ভিগ ভীর্গ্যাং! সেই হতভাগা আমার মাকে পর করে দিয়েছে, আবার সিলাকেও পর করে দিতে চায়?"

নিকোলা আর দাঁড়াইতে পারিল না। সে বাক্স হাতে করিয়া মেলার দিকে ছুটিল।

যাইতে যাইতে একবার সে ফিরিয়া দাঁড়াইল ; ভাবিল, "ক্রিস্টোফা হয়তো মুখফোঁড়, জেকবিনার সঙ্গে বেড়াতে চায় না, তাই তাকে রাগাবার জন্যে ঐ কথা বলে গেছে। হিঃ হিঃ হিঃ—এ নিশ্চয় সিলার মতলব।...আমি যে ওদের মতলব ধরে ফেলেছি, এ কথা কিন্তু সিলাকে বলতে হচ্ছে। দেখা হলেই বলব।"

নিকোলার মাথাটা অল্পক্ষণের জন্য যেন অনেকটা পরিষ্কার বোধ হইতে লাগিল। তার পর আবার সে ভাবিল—"আচ্ছা একবার ঘুরেই আসা যাক ; হয়তো ওরা মেলার ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। বাইরে থেকে আলো দেখছে।...দেখেই আসা যাক।"

নিকোলা মেলার পথেই চলিল।

লোকে লোকারণ্য—বাঁশী বাজিতেছে, ঢাক বাজিতেছে, আমোদের সীমা নাই।

হঠাৎ নিকোলার মন আবার কেমন দমিয়া গেল।

প্রবল বাতাসে এক এক দিকের লণ্ঠনগুলি একবার করিয়া স্তিমিত হইতেছে, আবার উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে।

নিকোলা ভিড়ের ভিতর অতি কষ্টে একখানি চেনা মুখের সন্ধান করিতেছিল। নাঃ, ভিড়ের মধ্যে সে নিশ্চয়ই নাই। তবে কি নিকোলা ভিতরটাও খুঁজিয়া দেখিবে ? নিশ্চয় !

নিকোলা ঠেলিতে ঠেলিতে একেবারে ফটকের সম্মুখে আসিয়া হাজির হইয়াছে।

"ঐ ! ঐ মেয়েটি ! না, ও যে ক্রিস্টোফা ;—সিলা কই ?"

"ওহে কর্তা ! তুমি কি নাচ-তামাশা দেখবার টিকিট নেবে ? না, শুধু মেলায় বেড়াবার টিকিট নেবে ?"

নিকোলা হিসাব করিয়া দেখিল, তাহার পকেটে যে পয়সা আছে তাহাতে দুই রকম হইবে না ; অগত্যা সে শুধু মেলায় ঢুকিবার টিকিটই লইল।

মেলায় ঢুকিয়া নিকোলা দেখিল, একদিকে একটা তাঁবুর ভিতর হইতে বামাকণ্ঠের স্বর ভাসিয়া আসিতেছে, মধ্যে মধ্যে প্রবল করতালি ও বাহবা। নিকোলা সমস্ত বাগান ঘুরিল ; কোথায় বা সিলা আর কোথায় বা ক্রিস্টোফা !

মাঝে মাঝে দুই-একজন শীতার্ত লোক, ফানুশের পাশে পোকার মতো, সঙ্গীতমুখর তাঁবুগুলার আশে পাশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তাহাদের পকেটের অবস্থা বোধ হয় নিকোলার মতো।

সহসা নিকোলার সমস্ত রক্ত মাথায় উঠিবার উপক্রম করিল। সে নিজের দৃষ্টিকে বিশ্বাস করিতে পারিল না।

তবু, দ্বিধা সত্ত্বেও, এক এক পা করিয়া সে একটা জানালার রুদ্ধ সাশির কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। ভিতরে আলো জ্বলিতেছে, নৃত্য চলিতেছে। কিন্তু ভাল করিয়া দেখা যাইতেছে না; সাশির ভিতরপিঠ ঘামিয়া ঝাপসা হইয়া উঠিয়াছে।

এই সময় সাশির একটা জায়গায় ঘাম গড়াইয়া পড়িল।

"ঐ যে ক্রিস্টোফা! সিলা কোথায়?... আঃ। জিজ্ঞাসা করা যায় কি করে?"

এইবার নিকোলা একজন পুরুষ মানুষের ওভারকোট-পরা মূর্তি দেখিতে পাইল; তাহার হাতে ছড়ি, মাথায় হালফ্যাসনের টুপি, মুখে চুরুট। এ যে লাড্ভিগ! ও কথা কয় কাহার সঙ্গে? ঐ যা! সরিয়া গেল! বোধ হয় নাচিতেছে। কিন্তু কাহার সঙ্গে?...কাহার সঙ্গে?

সাশির ঘাম এইবার দুই-তিন জায়গায় গড়াইয়া পড়িল। লাড্ভিগের বুকে মুখ রাখিয়া উহার সঙ্গে ও কে ও—কে নাচে?

ব্যস্! নিকোলা যথেষ্ট দেখিয়াছে। পরমুহূর্তেই প্রচণ্ডবেগে সে একেবারে নৃত্যশালার দরজায় গিয়া হাজির।

দরজা মুহুর্মুহু খুলিতেছে এবং মুহুর্মুহু বন্ধ হইতেছে। লোকের আনাগোনা অবিশ্রান্ত।

নিকোলা সকলকে ঠেলিয়া একেবারে গার্ডের সম্মুখে। গার্ড বলিল, "টিকিট?"

নিকোলা উত্তর দিল না।

"টিকিট কই? টিকিট?"

নিকোলা জোর করিয়া দরজার ফাঁকে মাথা গলাইতে গেল। একজন পাহারাওয়ালা উহাকে বাধা দিতে যাইতেছিল, সহসা উহার ভয়ঙ্কর চাহনি দেখিয়া পিছাইয়া পড়িল।

দরজার ফাঁক দিয়া নিকোলা আবার সিলাকে দেখিল। লাড্ভিগের সঙ্গে সে বাহিরের দিকেই আসিতেছে।

লাড্‌ভিগ অভ্যস্ত অহঙ্কারে সোজা হইয়া তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে এদিক ওদিক চাহিতে চাহিতে অগ্রসর হইতেছে। লোকটা এম্‌নি করিয়া সিলার মাথা খাইতে বসিয়াছে, অথচ দেখিলে মনে হয় যেন সকল মলিনতার উর্ধ্বে।

সহসা একটা কলরব উঠিল, "নিকাল দেও! নিকাল দেও!"

নিকোলা এবার ঠিক ঢুকিত, কিন্তু পুলিসের লোক এবং নাচঘরের লোক একত্র মিলিয়া উহাকে ঠেলিয়া বাহির করিয়া দিল। একজন পাহারাওয়ালা উহাকে ধরিয়া রহিল। ঠিক এই সময়ে সিলা ও লাড্‌ভিগ বাহির হইয়া চায়ের দোকানের দিকে যাইতেছিল।

এক ঝট্‌কায় পাহারাওয়ালার হাত ছাড়াইয়া নিকোলা একেবারে উহাদের ঘাড়ে গিয়া পড়িল।

সিলা ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল; নিকোলা উহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া একেবারে লাড্‌ভিগের সম্মুখে মুখোমুখী হইয়া দাঁড়াইল।

লাড্‌ভিগের মুখ একেবারে পাংশু; সহসা পাঠ্যাবস্থার পুরাতন প্রতিদ্বন্দ্বীকে চিনিতে পারিয়া অবজ্ঞায় তাহার মুখ ভীষণ হইয়া উঠিল।

"এই পাজী! বদমায়েশ! গুণ্ডা!" বলিয়া লাড্‌ভিগ সপাং করিয়া নিকোলার মুখে এক ঘা চাবুক মারিয়া বসিল। নিকোলাও অমনি এমনি জোরে উহার বুকে এক ঘুষি দিল যে, মাংস কাটিয়া জামার বোতাম গায়ে বসিয়া গেল।

ঠিক এই সময়ে একটি অল্পবয়স্কা স্ত্রীলোক পাগলের মতো ছুটিয়া আসিয়া উহাদের মাঝখানে পড়িল। ভিড় জমিয়া গেল।

"কামারের কুকুর! পাক্‌ড়ো উস্‌কো পাকড়ো! পুলিস! পুলিস!"

পুলিস আসিয়া নিকোলাকে ধরিল। লাড্‌ভিগও নিজেকে নিরাপদ বিবেচনা করিয়া ব্যঙ্গস্বরে বলিল, "যাও, এইবার হাজতে গিয়ে পচ; তুমি না হলেও সিলার বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে চলবে, আর, তার মেলায় ফুর্তি করবারও কোনো বাধা হবে না।"

লাড্‌ভিগের কথা ফুরাইতে না ফুরাইতে পুনর্বার পুলিসের হাত ছিনাইয়া নিকোলা বিদ্যুতের বেগে ছুটিয়া গিয়া একহাতে লাড্‌ভিগের জামা ধরিল এবং "এ জীবনে আর তোকে ও কথা মুখে আনতে হবে না" বলিয়া আর এক হাতে সজোরে সেই সেলাইয়ের বাক্সটা উহার মাথার উপর আছড়াইয়া ফেলিল।

লাড্‌ভিগ ঘুরিয়া বরফের উপর পড়িয়া গেল।

"খুন! খুন!" বলিয়া বহু লোক একসঙ্গে চীৎকার করিয়া উঠিল। কেহ বলিল, "ডাক্তারকে খবর দাও। এখানে কোথাও ডাক্তার নেই?"

ওদিকে তিনটা তাঁবুতে নাচের তালে বাজনা বাজিতেছে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই মূর্ছিত লাড্‌ভিগকে হাসপাতালে পাঠাইবার ব্যবস্থা হইল এবং নিকোলার হাতে হাতকড়ি পড়িল।

ইহার পর যখন উহাকে হাজতে পাঠাইবার বন্দোবস্ত হইল, তখন সেই অল্পবয়স্কা মেয়েটি আসিয়া উহাকে দুই হাতে বেষ্টন করিয়া ধরিল। অনেকে টিট্‌কারী দিল; ছেলের দল হো-হো করিয়া চেঁচাইতে শুরু করিল।

সিলা কারো কথায় কর্ণপাত না করিয়া, কোনো দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল, "তোমরা ওকে নিয়ে যেয়ো না গো, ওকে তোমরা নিয়ে যেয়ো না।···নিকোলা নিকোলা, তুমি ওদের বুঝিয়ে দাও—এ দোষ আমার—এ আমার অপরাধ। এর জন্যে তোমায় কেন হাজতে নিয়ে যাচ্ছে?"

সিলা কাঁদিতে কাঁদিতে অবসন্ন হইয়া পড়িল। এই অবসরে হাজতের গাড়ী ছাড়িয়া দিল। পিছনে পিছনে সিলাও চলিল। তাহার গায়ের কাপড় কোথায় পড়িয়া গিয়াছে তাহার ঠিকানা নাই।

গাড়ী থানায় ঢুকিল। নিকোলা বন্দী হইল। সিলা স্বচক্ষে সমস্ত দেখিল; আটক করিতে পারিল না।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়া গেল, সিলা সেই থানার দরজায় ধর্না দিয়া আছে। কনস্টেবল কতবার চলিয়া যাইতে বলিয়াছে, সে শোনে নাই। শেষে বসিয়া বসিয়া হতাশ হইয়া সে উঠিল, উঠিয়া চলিতে আরম্ভ করিল; কোন্‌দিকে যে যাইতেছে তাহার ঠিকানা নাই। মাঝে মাঝে দাঁড়াইতেছে।

ঝরণার উপরকার পুলের উপর আসিয়া সিলা থম্‌কিয়া দাঁড়াইল। কী অন্ধকার! কী গর্জন! পুলের উপর সিলা অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার মনে হইল, এই অন্ধতমসাবৃত গর্জনের সঙ্গে সে যেন কোন্ গভীর সূত্রে সংবদ্ধ।

সমস্ত রাত সে অবসন্নভাবে পড়িয়া রহিল, তাহার বুকে যেন পাষাণের ভার। নিকোলার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া সে অস্থির হইয়া উঠিয়াছে।

নিকোলার হাতে যে হাতকড়ি পড়িয়াছে, একথা কিছুতেই তাহার মন হইতে সরিল না। তাহার চোখের সামনে সেই হাতকড়ি। সিলার মনে

হইল, তাহার মাথা খারাপ হইতে বসিয়াছে ; সে বুঝি পাগল হইবে। আবার সে ভাবিল, নিকোলা বোধ হয় এখন সিলার নাম কানে শুনিলেও বিরক্ত হয় ; ছি ছি, সিলা কী কুকাজই করিয়াছে। সে শুধু নিজের আমোদের কথাই ভাবিয়াছে,—আর যে লোকটা তাহার সুখের জন্য, তাহাকে সৎপথে রাখিবার জন্য, দিনরাত পরিশ্রম করিয়াছে, হাতুড়ি পিটিয়াছে, সমস্ত আমোদ বর্জন করিয়া, সুখের সংসার পাতিবার আশায়, একটি একটি করিয়া পয়সা জমাইয়াছে, হায়! তাহার সুখ-দুঃখের কথা সিলা একবারও ভাবে নাই। যাহার জন্য সে এত ত্যাগ স্বীকার করিয়াছে, সেই সিলার দুর্বুদ্ধির দোষে নিকোলা আজ হাজতে।

ভাবিতে ভাবিতে সকাল হইয়া গেল, সিলা সেই পুলের ধারেই বসিয়া রহিল। এখনো তাহার মাথার মধ্যে গত রাত্রের দুর্ঘটনার ছবি ক্রমাগত ঘুরিতেছে। দেখিতে দেখিতে বেলা বাড়িল ; আবার বেলা পড়িয়া আসিল। শেষে, গ্যাস জ্বালিতে দেখিয়া সিলার চমক ভাঙিল। সে উঠিয়া বরাবর থানার দিকে চলিল। থানায় পৌঁছিয়া প্রথমতঃ কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা করিতে উহার সাহস হইল না। ক্রমে বরফ পড়িতে আরম্ভ হইল। তখন সে সাহসে ভর করিয়া ইন্‌স্পেক্টরের ঘরে ঢুকিয়া পড়িল।

"কি চাও ?"

"নিকোলার খবর।"

"নিকোলা ? কোন্ নিকোলা ?"

"সেই কাল রাত্রে যে এসেছে।"

"সেই খুনের আসামীটা ? তাকে কেন ? তুমি তার কে হও ? বোন ?"

"না।"

"ও!……তা' তার খবর আর কি শুনবে ? তার জীবনের আশা নেই ; কাল যাকে সে ঘায়েল করেছে তার দফা নিকেশ হয়ে গেছে, আজ বেলা দু'পরের সময় সে মারা গেছে। আসামীকে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে।"

সিলা থানা হইতে বাহির হইয়া, কেমন করিয়া কখন যে পুলের উপর হাজির হইল, তাহা উহার খেয়াল ছিল না। বরফ পড়িতেছে তবুও বেচারীর হুঁস্ নাই।

এই তো—এই তো তাহার বিশ্রামের স্থান।

নিকোলার হাতে হাতকড়ি, সে না জানি কতই কাঁদিতেছে, কতই

ডাকিতেছে।' লিনা আর তাহার কাছে মুখ দেখাইতে পারিবে না। এ জীবনে আর নয়।

লিনার চোখে এখন অন্ধকার, কানে শুধু প্রপাতের আহ্বান।

* * * *

পরদিন সকালে দেখা গেল, পুলের নীচে নদীর ধারে বরফের ভিতর হইতে স্ত্রী-পরিচ্ছদের একটা টুকরা দেখা যাইতেছে। অভাগিনী লিনা! সে স্রোতের জলেও বিস্মৃতিলাভ করিতে পারে নাই, কিনারায় কঠিন বরফের উপর পড়িয়া উহার মাথার খুলি একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

* * * *

ডাক্তারের পরীক্ষায় সাব্যস্ত হইল মাথার আঘাতই লাড্‌ভিগ ভীর্গ্যাণ্ডের মৃত্যুর কারণ। মাথার খুলি ভাঙিয়া মস্তিষ্কের ভিতর হাড়ের কুচি ঢুকিয়া গিয়াছে।

মকদ্দমার দিন নিকালোকে আদালতে হাজির করা হইল। সে ইহার মধ্যেই লিনার মৃত্যু-সংবাদ পাইয়াছে। এখন আর তাহার জীবনে স্পৃহা নাই। হাকিম যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন তুমি ওকে খুন করলে?" নিকোলা বলিল, "ইচ্ছা করেই খুন করেছি, ইচ্ছা করেই প্রাণে মেরেছি। যদি ওর একটা প্রাণ না হয়ে সাতটা প্রাণ হ'ত, তা হ'লেও ওকে বাঁচতে দিতুম না।"

নিকোলার এই রকম চোটপাট্‌ জবাবে হাকিম সুদ্ধ উহার প্রতি বিরূপ হইয়া বসিলেন।

বাপের নাম জিজ্ঞাসা করায় নিকোলা বলিল, "বাপের খবর জানিনে; সে সৌভাগ্য এ জীবনে হয়নি। মায়ের নাম বার্বারা, লোকে বলে সে আমার মা। যে হতভাগা আমার ইহজীবনের সমস্ত সুখ হরণ করেছে, পূর্বে সেই আমায় মাতৃস্তন্যেও বঞ্চিত করেছিল।"

এই সময়ে ভিড়ের ভিতরে একজন স্থূলকায়া প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

পুলিসের সাক্ষ্যে ইহাও প্রকাশ হইল যে বর্তমান আসামী একবার একটি বালিকার নিকট হইতে টাকা ভুলাইয়া লইবার অপরাধে অভিযুক্ত হয়, পরে প্রমাণাভাবে মুক্তিলাভ করে। এতদ্ভিন্ন পাঠ্যাবস্থায় লাড্‌ভিগের সঙ্গে মারামারি এবং অল্পদিন পূর্বে কারখানার মিস্ত্রি ওলফ্‌কে হাতুড়ি দেখাইয়া শাসনের কথাও চাপা রহিল না।

হাকিমের রায়ে নিকোলার যাবজ্জীবন কারাবাসের ব্যবস্থা হইল। "স্ত্রীলোক-ঘটিত ব্যাপারে খুন চাপা কতকটা স্বাভাবিক বিধায় ফাঁসির হুকুম দেওয়া গেল না।"

* * * *

দীর্ঘ মেয়াদের কয়েদীদিগকে যে পথ দিয়া কয়েদখানায় লইয়া যাওয়া হইতেছিল, তাহারি অদূরে সৈন্যরা চাঁদমারিতে লক্ষ্যভেদ শিক্ষা করিতেছিল।

কয়েদখানার দেওয়ালে একটা প্রকাণ্ড ছিদ্রপথে কয়েদীরা একে একে প্রবেশ করিতেছে। যে লোকটা সকলের পিছনে ছিল, সে শিকলে টান পড়িলেও একবার দাঁড়াইল; দাঁড়াইয়া চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

দূরে পাইনের বন সবুজ হইয়া উঠিয়াছে। প্রপাতের জল যেন আনন্দে উছলিয়া পড়িতেছে। কয়েদীটা মুগ্ধের মতো চাহিয়া আছে।

"তুই এখন পালাতে পারলে বাঁচিস্, না? কি বলিস্ নিকোলা?"

"মানুষের স্বভাবই তাই।"

"বেশ তো, ভাল মানুষের মতো থাক, চাই কি এক-আধ বছর মাফ হতেও পারে। আর ক'টা বছর বই তো নয়,—দেখতে দেখতে কেটে যাবে।"

নিকোলা অসহিষ্ণুর মতো উগ্রভাবে মাথা নাড়িল এবং বলিল, "উঁ হুঁ! একবার বেরুলে কি হবে? আবার ফিরে আসতে হবে। আমার আজন্ম এই রকম। আমি দেখছি, হয় জগৎটাকে কয়েদ করে রাখতে হবে, না হয় আমায় আটকাতে হবে। ভেবে দেখলুম, ওটা একজনের উপর দিয়েই যাওয়া ভাল; দুনিয়া সুখে থাক,—কয়েদের ভোগটা আমিই ভুগি।"

নিকোলা আর দাঁড়াইল না। উহার হাতের বেড়ী, পায়ের শিকল গতির চাঞ্চল্যে পুনর্বার মুখর হইয়া উঠিল; শিকল বাজিতে লাগিল ঝম্-ঝম্-ঝম্।